বঙ্কিমচন্দ্র
১৭৫

শ্রীঅরবিন্দ গবেষণা ট্রাস্ট

বঙ্কিমচন্দ্র ১৭৫

(১৭৫তম জন্মবর্ষ স্মরণে ১৮৩৮-২০১৪ খ্রীঃ)

শ্রীঅরবিন্দ গবেষণা ট্রাস্ট

১১০, সতীন্দ্রপল্লী, কলকাতা - ৭০০০৮৪

বঙ্কিমচন্দ্র-১৭৫

(১৭৫তম জন্মবর্ষ স্মরণে)

সম্পাদক ঃ সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ঃ বিশ্বজিৎ সাহা

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅরবিন্দ গবেষণা ট্রাস্ট
১১০, সতীন্দ্রপল্লী, কলকাতা ৭০০০৮৪

মুদ্রক ঃ
ডাইমেনশন
এ-২/৫৫ ডায়মন্ড পার্ক, জোকা,
কলকাতা - ৭০০১০৪

মূল্য ঃ ১৫০ টাকা

সূচীপত্র

মুখবন্ধ ৫

স্মরণ

বন্দেমাতরম্	বঙ্কিমচন্দ্র	৯
HYMN TO THE MOTHER (বন্দেমাতরম্-এর ইংরেজী অনুবাদ)	শ্রীঅরবিন্দ	১১

শ্রীঅরবিন্দের চারটি রচনা*

- বঙ্কিমের যুগের বাংলা ১৩
- বঙ্কিমের বহুমুখী প্রতিভা ১৮
- বঙ্কিমের সাহিত্য জীবনের ইতিহাস ২২
- বাংলার জন্যে বঙ্কিম কী করেছেন ২৭

বঙ্কিমচন্দ্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩২

সাম্প্রত

বঙ্কিমচন্দ্রের পড়াশোনার জগৎ	অলোক রায়	৩৩
সাহিত্য ও ধর্মের পটভূমিকায় বঙ্কিমমানস	সন্তোষকুমার দত্ত	৪৫
বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ ও বাংলাসাহিত্য	অশোককুমার রায়	৫৪
সাহিত্য সম্রাটের সমগ্র ভাবনায় কবিপ্রাণতা	অধীরকৃষ্ণ মণ্ডল	৫৯
বঙ্কিমের কমলাকান্ত, কমলাকান্তের বঙ্কিম	ড. বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৮
বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ঃ সৌহার্দ্য থেকে বিতর্কে	অলক মণ্ডল	৭৮
কেন বঙ্কিম?	বিপ্রদাস ভট্টাচার্য	৯১
সম্রাট ও দার্শনিক	ড. নলিনীরঞ্জন কয়াল	৯৬
বঙ্কিম ভাবনায় নারী	ড. শিপ্রা মজুমদার	১০৩
বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষচর্চা	ড. বিজলি সরকার	১১৩

সমুদ্ধার

পত্রসূচনা	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১২৩
বঙ্গদর্শনের বিদায়গ্রহণ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩২
বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১৩৫
সূচনা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪৭
বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মশিক্ষা	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৫১
জাতি প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র	দিলীপকুমার বিশ্বাস	১৫৮
পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বঙ্কিমচর্চা	হাসান আজিজুল হক	১৮৩

* শ্রীঅরবিন্দ যখন বরোদায় চাকুরীরত তখন এই প্রবন্ধগুলি ইংরেজীতে লিখেছিলেন। ১৮৯৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ১৯৫৭ সালে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী থেকে পশুপতি ভট্টাচার্যের বঙ্গানুবাদে 'বঙ্কিমচন্দ্র' শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে, ১৮৭৯ সালে মাত্র সাত বছর বয়সে দুই ভ্রাতার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের ইংল্যাণ্ড যাত্রা। তার প্রায় চৌদ্দ বছর পর ১৮৯২ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। তখন তাঁর বয়স বিশ বৎসর। দেশে ফিরে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা শিখে বঙ্কিম-সাহিত্য সহ বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য রচনা ও সংস্কৃত সাহিত্যের মনোজ্ঞ অধ্যয়ন শুরু। ভাবতে আশ্চর্য লাগে – কী অত্যাশ্চর্য দক্ষতায় তিনি বঙ্কিমসৃষ্টির সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতের মূল্যায়ন করেছেন! শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নন, মূল রামায়ন মহাভারত সহ কালিদাস বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস নিবিড়ভাবে পাঠ করেছেন। তাঁদের রচনা ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন, "মহাকবি দান্তের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, হোমারের ইলিয়াডপাঠে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। ইওরোপের ইতিহাসে তাহা অতুলনীয় কিন্তু কবিত্বে বাল্মিকী সর্বশ্রেষ্ঠ। রামায়ণের তুল্য মহাকাব্য পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই।"

– সম্পাদক

মুখবন্ধ

জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বঙ্কিম বাঁকা কেন?"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, "জুতোর চোটে।"

এখন প্রচ্ছন্ন রসিকতার মাঝে কী ভেবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই প্রশ্নটি বঙ্কিমচন্দ্রকে করেছিলেন এবং কীরূপ অভিজ্ঞতাকে প্রচ্ছন্ন রেখে বঙ্কিমচন্দ্র এই তীক্ষ্ণ সরস উত্তরটি দিয়েছিলেন – তা আমাদের স্পষ্ট করে জানার অবকাশ নেই। কিন্তু এটুকু আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতকে, তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার পথকে একটু সোজাসুজি দেখতে চাইছেন। আর বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো বলতে চাইছেন, তাঁর অভিমত গঠনের ও মতামত প্রকাশের পন্থা, তাঁকে সোজা থাকতে দিচ্ছে না! ইংরাজ-বাহাদুরের সেরেস্তায় কর্মজীবন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিগত দর্শনগত দ্বান্দ্বিকতার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝে নিতে হচ্ছে, গড়ে তুলতে হচ্ছে – নিজস্ব অভিমতের ভিত্তিভূমি। আর যে মহান প্রতিনিধিত্বের দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছেন তা অকল্পনীয়। তাঁর মনে হলো জাতির চরিত্র-গঠনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা তাঁকে পালন করতে হবে। নিজস্ব সাহিত্যের বিষয় সন্ধানই শুধু নয় ভাষা নির্মাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না – এ সমস্তটাই তাঁকে করতে হয়েছে প্রায় শূন্যের ওপরে দাঁড়িয়ে। এবং বঙ্গদেশে এমনই এক সাহিত্য-সংস্কৃতি ও দর্শনের ভিত্তি তিনি নির্মাণ করে দিয়ে গেলেন যা ব্যতিরেকে আজকের বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশ কল্পনাও করা যায় না। মনে পড়ে যায় 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উক্তি –

"যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়

সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন ঃ "আজ বাংলা ভাষা কেবল দৃঢ়বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে। মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন তিনি বাঙালীর যে কী মহৎ কী চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় – তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই।"

এ হেন কর্মের উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বঙ্কিম বাঁকা কেন' – প্রশ্নের উত্তরে বলেন 'জুতোর চোটে' তখন আমাদের দৃষ্টি আপন পদযুগলের দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছাড়া আর কোথাও অভিযোজনের জায়গা খুঁজে পায় না!

তবু বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজনীশক্তি ও চেতন-প্রবাহ এতই বলশালী যে উত্তরকাল তাঁকে বিস্মৃত-প্রদেশে রেখে নিদ্রাসুখ পেল না। কিন্তু বঙ্কিম-প্রতিভার আকর্ষণী শক্তির সূত্রটা কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে, বোধহয় বলা যায় তাঁর বিকর্ষণের শক্তিতেই রয়েছে আকর্ষণের মূলসূত্র! নইলে একশতপঁচাত্তর বর্ষেও বঙ্কিম এত তপ্ত কেন? তাঁর অভিমতকে গ্রহণ করতে না পারলেও তাকে ঔদাসীন্যের বর্জ্যভূমিতে নিক্ষেপ করে শান্তি পাওয়া যায় না। কেন? কারণ বঙ্কিম-সৃষ্টি শান্তিদায়ক নয়, বঙ্কিম-মতবাদ স্বস্তিদায়ক নয়। প্রবল-প্রাণবেগে আদ্যন্ত আলোড়ন! বাঁধভাঙা বন্যার মতো প্রবল তার অভিঘাত! তা উপন্যাসেই হোক, আর প্রবন্ধ নিবন্ধেই হোক। এমনকি, তাঁর সৃষ্ট পাত্রপাত্রীরাও স্রষ্টা বঙ্কিমের সামনে (তাঁর অভিমত, অভিরুচি, সামাজিক দায়বদ্ধতার সামনে) প্রতিস্পর্ধীর মতো এসে দাঁড়ায়। তাই তাঁরা কালজয়ী। যুগের নিদ্রাপহারী!

বাংলা ভাষার সংস্কার শুধু নয়, তিনি উপন্যাসে, প্রবন্ধে নিবন্ধে এমন এক তর্কশীলতার ধারা নিয়ে এলেন, যা অভিনব এবং সমাজমানসকে প্রবল অভিঘাতে আলোড়িত করলো। মানবপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ, দেশপ্রেম, সম্প্রদায়গত মৈত্রী, সাম্য-স্বাধীনতার স্বরূপ প্রভৃতি ধারণাগুলি নতুন রূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তর্ক তুললেন। বাদ-বিসম্বাদ-সম্বাদে সমাজ-মানস তপ্ত হয়ে উঠলো। আজও সেই তাপ-প্রবাহ বঙ্কিম বলয়ে স্তিমিত হলো না। কিন্তু যে সুগভীর তর্কশীলতার সংস্কৃতি তিনি নিয়ে এলেন আমরা তার ধারাবাহ বজায় রাখতে পারলাম না। অধুনা আমাদের যাবতীয় তর্কশীলতা, যদি তর্কশীলতা বলে আদৌ কিছু থাকে, তা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার শয়নকক্ষে শায়িত।

'বঙ্কিম-১৭৫' গ্রন্থটির প্রকাশ শুধুমাত্র সাহিত্যসম্রাটের জন্মবর্ষ-উদ্‌যাপনের স্মারক স্বরূপ নয়। কালপ্রবাহে জেগে থাকা শতসপ্ততিপঞ্চক (১৭৫) বর্ষ-ফলকটির সামনে একবার অবনত হয়ে প্রণাম জানানো।

এই গ্রন্থটিকে আমরা তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি ঃ

(১) স্মরণ (২) সাম্প্রত (৩) সমুদ্ধার

'স্মরণ' অধ্যায়ে আমরা সংস্থাপিত করেছি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' এবং শ্রী অরবিন্দকৃত ইংরেজী অনুবাদ। সেই সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দর 'বঙ্কিমচন্দ্র' বিষয়ক চারটি রচনা। এবং রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা – 'বঙ্কিমচন্দ্র'।

'সাম্প্রত' অধ্যায়ে আমাদের সমকালীন লেখকদের রচনা। যশস্বী প্রবীণ থেকে প্রতিভাবান নবীন লেখকদের রচনা এই অধ্যায়ে।

'সমুদ্ধার' অধ্যায়ে আমরা নিরত থেকেছি আমাদের রত্নভাণ্ডার থেকে মণিমাণিক্য আহরণে। এই অধ্যায়ে আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত ঘটেছে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার গর্ভগৃহে। আমরা সেখান থেকে আহরণ করেছি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত প্রথম সংখ্যার 'পত্রসূচনা'। তার চার বৎসর পর বঙ্কিমচন্দ্র যখন সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে বিদায় নিচ্ছেন তখন লিখেছিলেন 'বঙ্গদর্শনের বিদায়গ্রহণ', সেই লেখাটি আমরা এই অধ্যায়ে সঙ্কলিত করেছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ্রহণ করলেন 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার দায়িত্ব। আমরা তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' থেকে সংগ্রহ করলাম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি মূল্যবান রচনা ঃ 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি'। যে রচনাটি পড়ে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, লেখাটি পড়ে মনে হয় যেন কোনো জার্মান পণ্ডিতের রচনা।

আমরা সংগ্রহ করলাম চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মশিক্ষা'।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমরা তাঁর সম্পাদিত প্রথম সংখ্যা থেকে চয়ন করলাম 'সূচনা' নামক প্রতিবেদনটি।

সাম্প্রতিক-কালের বঙ্গদর্শন থেকে আমরা সংগ্রহ করলাম বঙ্কিমভবন গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ড. সত্যজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত বঙ্গদর্শন-১ সংখ্যা থেকে দিলীপকুমার বিশ্বাসের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রচনা – 'জাতি প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র'। এছাড়া, এই অধ্যায়ের আর একটি মূল্যবান রচনা বঙ্গদর্শন পত্রিকা থেকে আহরিত ওপার বাংলার স্বনামধন্য লেখক হাসান আজিজুল হক রচিত – 'পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বঙ্কিমচর্চা'।

'স্মরণ' ও 'সমুদ্ধার' অধ্যায়ে যে রচনাগুলি সঙ্কলিত হয়েছে তার পিছনে আমাদের যে চিন্তা-প্রণালী কাজ করেছে তার ব্যাখ্যা বাহুল্য বোধ হবে। পাঠকবর্গ নিশ্চয় আমাদের চিন্তানুসার বুঝতে পারবেন। তবে এই কথাটুকু বোধহয় সবিনয়ে বলা যায়, কিছু কিছু ফিরে দেখা থাকে, যে দেখার আলো শুধু বর্তমানকেই আলোকিত করে না, অনাগত কালের যাত্রাপথেও সালোকসংশ্লেষ ঘটায়। 'স্মরণ' ও 'সমুদ্ধার' অধ্যায় দুটি যেন সেই সংশ্লেষের বাতিদান।

এই গ্রন্থটি প্রকাশে যাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেছেন, যাঁদের সহায়তা ছাড়া সত্যই এ গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হতো না, তাঁরা হলেন, বঙ্কিমভবন গবেষণা কেন্দ্রের রিসার্চ ফেলো ড. বিজলি সরকার, ভ্রাতৃপ্রতিম নবীন প্রাবন্ধিক শ্রী অলক মণ্ডল, প্রাবন্ধিক ও নাট্যগবেষক আমার বহুদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রী অনীত রায়। এ গ্রন্থের মুদ্রণভ্রান্তি সংশোধনের কাজেও অনীতের

সহায়তা উল্লেখযোগ্য।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি নৈহাটি, বঙ্কিমভবন গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ড. সত্যজিৎ চৌধুরীর প্রতি এবং মহাকরণস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সচিবালয় গ্রন্থাগারের শ্রদ্ধেয় পরিচালকমণ্ডলীর প্রতি।

কৃতজ্ঞতা জানাই সম্মানীয় লেখকবৃন্দের প্রতি যাঁরা আমার অগ্রজ-প্রতিম, বাংলা ভাষা সাহিত্যের নিবিড় গবেষক, প্রিয় বন্ধুবর্গ, তাঁরা যেভাবে সাগ্রহ সহায়তা দিয়েছেন তা অবিস্মরণীয়।

কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীঅরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচার-এর পরিচালনমণ্ডলী ও গবেষণা ট্রাস্ট-এর প্রতি এবং প্রতিষ্ঠানের সচিব বন্ধুবর শ্রী রঞ্জন মিত্রের প্রতি। এই গ্রন্থের বিষয়-প্রস্তাবক তিনিই। পরিকাঠামোগত সহায়তা দানে তাঁর নেপথ্য-ভূমিকা এবং প্রত্যক্ষ- প্রেরণা ছাড়া এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হতো না।

সবশেষে সবিশেষ কৃতজ্ঞতা – 'স্মরণ' অধ্যায়ের রচনাগুলির জন্য শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরীর শ্রদ্ধেয় পরিচালনমণ্ডলীর প্রতি।

এখন প্রকাশোন্মুখ এই 'বঙ্কিমচন্দ্র-১৭৫' গ্রন্থটি পাঠক-বৃত্তে সমাদৃত হলে আমাদের যাবতীয় শ্রম ও প্রয়াস সার্থক হবে।

বিনতি সহ
সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায়

স্মরণ

বন্দে মাতরম্।

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাম্
শস্য-শ্যামলাং মাতরম্।।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীন্
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্।।

সপ্তকোটি-কণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে,
দ্বিসপ্তকীটি-ভুজৈর্ধৃত-খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে!

বহুবল-ধারিণীং নমামি তারিণীম্
রিপুদল-বারিণীং মাতরম্।।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণা: শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী
কমলা কমল-দল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাম্
নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্,
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।।

* ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বন্দে মাতরম গানটির কথা সংস্কৃত এবং বাংলার মিশ্রিতরূপেই ছিল, কিন্তু সেই প্রথম প্রকাশকাল থেকেই এখন পর্যন্ত প্রামাণ্য বঙ্কিম রচনাবলীতে গানটির হরফ ব্যবহার করা হয়েছে বাংলা।

জাতীয় স্তোত্র হিসেবে গানটির প্রথম যে স্তবক দুটো গ্রহণ করা হয়েছে তার ভাষা সম্পূর্ণই সংস্কৃত। আর গানটি যেহেতু মূলত সংস্কৃত ভাষায় রচিত, পরে বাংলা কথার পঙক্তি সংযোজিত হয়েছে সংস্কৃত পঙক্তির ফাঁকে ফাঁকে, সেইজন্য আমরা মনে করি সংস্কৃত ভাষাই গানটির মূল বাহন।

সেইজন্য গানটির ভাব এবং প্রকাশভঙ্গিগত ধ্রুপদী রীতির কথা মনে রেখে আমরা সম্পূর্ণ গানের কথাতেই দেবনাগরী হরফ ব্যবহার করলাম।

বন্দে মাতরম্

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাম্
মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং
মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটীকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখর-করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।

বহুবলধারিণীং
নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং
মাতরম্।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িণী
নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্
অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাম্
মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাম্
সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্
মাতরম্।

HYMN TO THE MOTHER

Bande Mataram

Mother, I bow to thee!
Rich with thy hurrying streams,
Bright with thy orchard gleams,
Cool with thy winds of delight,
Dark fields waving, Mother of might,
Mother free.

Glory of moonlight dreams
Over thy branches and lordly streams, –
Clad in thy blossoming trees,
Mother, giver of ease,
Laughing low and sweet!
Mother, I kiss thy feet,
Speaker sweet and low!
Mother, to thee I bow.

Who hath said thou art weak in thy lands,
When the swords flash out in seventy million hands
And seventy million voices roar
Thy dreadful name from shore to shore?
With many strengths who art mighty and stored,
To thee I call, Mother and Lord!

Thou who savest, arise and save!
To her I cry who ever her foemen drave
Back from plain and sea
And shook herself free.

Thou art wisdom, thou art law,
Thou our heart, our soul, our breath,
Thou the love divine, the awe
In our hearts that conquers death.
Thine the strength that nerves the arm,
Thine the beauty, thine the charm.

Every image made divine
In our temples is but thine.

Thou art Durga, Lady and Queen,
With her hands that strike and her swords of sheen,
Thou art Lakshmi lotus-throned,
And the Muse a hundred-toned.
Pure and perfect without peer,
Mother, lend thine ear.
Rich with thy hurrying streams,
Bright with thy orchard gleams,
Dark of hue, O candid-fair
In thy soul, with jewelled hair
And thy glorious smile divine,
Loveliest of all earthly lands,
Showering wealth from well-stored hands!
Mother, mother mine!
Mother sweet, I bow to thee
Mother great and free!

Translated by Sri Aurobindo

বঙ্কিমের যুগের বাংলা

শ্রীঅরবিন্দ

যে সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে এসে বঙ্কিম মানুষ হয়ে উঠলেন, সে হ'ল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের নবজাগ্রত বাংলার নবযৌবনের অবস্থা, নতুন ভাবে উদ্দীপিত, নতুন প্রেরণায় উচ্ছ্বসিত; এমন একটা উৎসাহপূর্ণ যুগ ভারতে বোধ করি আর কখনও আসে নি। তখনকার ভারতে বাংলাই ছিল জাগরণ-বিকাশের প্রধান রঙ্গভূমি, পুনরভ্যুত্থানের ক্রিয়া এখানেই প্রথম স্বল্পপরিধির মধ্যে তখন সবে শুরু হয়েছে। বাঙালী জাতি স্বভাবতই কিছু কৌতূহলী ও কল্পনা-প্রবণ, বহুকাল পর্যন্ত নিজেদের একটিমাত্র ঐতিহ্য নিয়ে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে গতানুগতিকভাবে দিন কাটাচ্ছিল, হঠাৎ ভিন্ন দেশের নতুন রকম শিক্ষা ও শিল্পাদির সংস্পর্শে এসে পেয়ে গেল এক অভূতপূর্ব চেতনারাজ্যে প্রবেশ করবার অপরূপ চাবিকাঠি। এদের উন্মুখ প্রকৃতির সঙ্গে এসে মিশল স্বতন্ত্র-জাতীয় প্রকৃতির মানুষদের গড়া এক নতুনতর সভ্যতা ও শিল্প-সাহিত্যের প্রভাব। তার ফলে যা হবার তাই হ'ল, এদের মধ্যে গ'ড়ে উঠল এমন এক সম্পূর্ণ নতুন রকমের সভ্যতা ও শিল্প ও সাহিত্য, যা একেবারেই মৌলিক। মৌলিকত্ব জিনিসটা বাইরের সকল প্রভাবকে তফাতে রেখে ভুঁইফোড় হয়ে গজায় না, বরং সকল প্রভাবকে মেনে নিয়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্যের ছাঁচে তাকে ঢালাই ক'রে নিতে পারলে তাতেই সেটা জন্মায়। বাংলা দেশে ঠিক সেই জিনিসই তখন ঘটেছিল এবং ভবিষ্যতে আরও তা ঘটতে পারে। এর প্রথম ফল যা হ'ল তা অতি আশ্চর্য, কারণ কল্পনাতীত মৌলিকতা নিয়ে মহা মহা গুণী ব্যক্তিদের এখানে উপর্যুপরি বিকাশ পেতে দেখা গেল। প্রথমে রামমোহন রায় আবির্ভূত হলেন তাঁর নতুন ধরণের ধর্মবার্তা নিয়ে, তার পরে সেই বার্তা আরও নবতর ভাবে প্রচারিত হতে থাকল এমন সব ব্যক্তির দ্বারা, যাঁরা তাঁর চেয়ে কোনো অংশে ছোট নন, যেমন রাজনারায়ণ বসু ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভাষার দিক দিয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত ও মধুসূদন দত্ত, এঁরা দুজনে দুই দিক থেকে নতুন ধরণের গদ্য পদ্য রচনা করতে শুরু করলেন। তখন এলেন বিদ্যাসাগর, বিদ্যায় বুদ্ধিতে ও প্রজ্ঞায় যাঁকে বলতে হয় বাংলার ছত্রপতি, বাংলা ভাষাকে ও বাঙালী জাতিকে আবার নতুন ক'রে গড়বার জন্যে যেন অসুরের মতো তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করলেন। এদিকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে এমন বিরাট হয়ে উঠলেন যে, কোনো তুলনাই তাঁর দেওয়া যায় না। এঁদের সঙ্গে সঙ্গে আরও এমন অসামান্য রসজ্ঞ ও রসিক ব্যক্তিদের একটা দল গ'ড়ে উঠল, যাঁদের প্রত্যেককেই বলা যেতে পারে প্রতিভার প্রতিমূর্তি, তাঁরা যেমন গুণী তেমনি সমঝদার, বহুবিধ শিল্পে ও সঙ্গীতে সমান পারদর্শী, রীতিমত মার্জিতরুচি, সংস্কৃতির দিক দিয়ে তাঁদের মৌলিকতা কিছু কম নয়। এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে মধুসূদনের বন্ধুদের কথা, যেমন গৌরদাস বসাক, বিদ্যোৎসাহী রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ওই সময়টিতে আরও দেখা গেল যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে সঙ্গে এখানেও এক নব ভাবের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা অঙ্কুরিত হচ্ছে, যদিও তা অনেকটা ইংরেজদেরই নকলে। নবশক্তি স্ফুরণের এই সব নানা শাখার মধ্যে বাঙালীর মন বিশেষ ক'রে প্রবল বেগে ধাবিত হ'ল সাহিত্যের খাতে। এটা তাদের পক্ষে স্বাভাবিকই হয়েছিল; কারণ বাঙালী যদিও বহু শতাব্দী থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মবাদকে অবলম্বন ক'রে এক এক ধরণের ধর্মচর্চা নিয়েই ব্যস্ত থাকত, তা ছাড়া যদিও বিদ্যাচর্চা ও আইনচর্চার দিকে তাদের বিশেষ ঝোঁক ছিল, কিন্তু ভাষার দিকে ছিল তাদের একটা প্রকৃতিগত প্রাণের টান। এ ছাড়া আরও একটা কথা এখানে ভুলে গেলে চলবে না। আমাদের দেশে যে পুনরভ্যুত্থান দেখা গেল, তা এসেছিল ইউরোপের ইতিহাসের পুনরভ্যুত্থানের আদর্শে আগেকার যুগের যত গতানুগতিক নীতিকে নাকচ ক'রে দিয়ে। এখানকার বেলাতেও আগেকার সেই নিরীহ, নির্বিরোধ, ভক্তিবাদী ও কর্তব্যবাধ্য হিন্দু আদর্শকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বাঙালী যেন তার অনেক কালের মরচে-পড়া লৌহনিগড় থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেল, তার বহুকালের বরফ-জমা রক্তধারা যেন আবার আপন স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হতে শুরু করল, মুক্তজগতের মুক্ত বায়ু সেবন ক'রে তাই যেন সে নতুন ক'রে নিজের প্রাণের স্বাভাবিক স্ফূর্তি ফিরে পেল। আগেকার হিন্দুরা জীবনকে অসারবোধ ক'রে মনে গভীর একটা নেতিবাদ নিয়ে থাকতেন; কিন্তু সেদিন তরুণ দলের বাঙালীরা দেখলে যে, জীবনকে আনন্দ দেবারও অনেক জিনিস আছে, বস্তুত জীবন হ'ল এক পরম সৌভাগ্য। তখন নতুন যুগের তাই হ'ল নীতিবাদ, জীবনকে উপভোগ করার প্রতি এক প্রবল অনুরাগ, মানুষের জীবন সৌন্দর্যে ও সুষমায় উচ্ছলিত নবোঢ়া বধূটির মত অতীব উপভোগ্য। এ হ'ল ষোড়শ শতাব্দীর মনোভাব, যা গ্রীসে পৌত্তলিকতার যুগে একবার দেখা গিয়েছিল, আবার ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে নতুন ক'রে এসেছিল; সেই ভাবটাই অপেক্ষাকৃত স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণে দেখা দিল নব্য বাংলায়। তখনকার দিনের শিক্ষিত ব্যক্তিরা ও যুবকেরা যা কিছুই করতে যেত, তার মধ্যেই ফুটে উঠত তাদের প্রাণের সেই উপচে পড়া স্ফূর্তি ও উৎসাহ। তাই বিদ্যা অর্জন করত তারা প্রবল আগ্রহে, শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকত প্রভুত পরিমাণে, এই গ্রহণযোগ্যতা সাধারণের গণ্ডীকে ছাড়িয়ে যেত। মধুসূদন দত্ত

ইংরেজী, বাংলা এবং সংস্কৃত ছাড়াও শিখে ফেললেন গ্রীক, ল্যাটিন, ইটালীয় ও ফরাসী ভাষা; এই ফরাসী ভাষাতে তিনি অনর্গল লিখে যেতে পারতেন। অসাধারণ এক তারুণ্যের প্রতিভা নিয়ে জন্মালেন তরু দত্ত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিদেশী ভাষার উপর দিয়েই সে প্রতিভার অযথা অপব্যয় ক'রে অকালে তিনি অল্পবয়সেই মারা গেলেন। তিনিও শিখেছিলেন গ্রীক ভাষা। ইংরেজী ভাষাতে তিনি খুবই চমৎকার লিখতেন, কিন্তু ফরাসীতেও তাঁর কম দক্ষতা ছিল না। তাঁর লেখা ফরাসী নভেল ওই দেশের লোকেরা খুব আদরের সঙ্গে পড়ত, আর তাঁর লেখা অপূর্ব ফরাসী সঙ্গীত তখন জার্মানির বিরুদ্ধে ফরাসী জাতির মনে উদ্দীপনা জোগাত। এঁদের প্রত্যেকেরই প্রচুর পড়া-শোনার বিষয়ে যেমন একটা অসাধারণত্ব ছিল, এদের জীবন-ব্যাপার সম্বন্ধেও ছিল তাই। যাকে বলে মস্ত বহরের মানুষ, এঁরা ছিলেন ঠিক তাই – যা কিছু করতেন সবই বেশি বেশি মাত্রায়। এঁরা শিখেছেনও যত বেশি, লিখেছেনও তত বেশি; আবার চিন্তাক্রিয়াও যত বেশি, পানক্রিয়াও তত বেশি চালিয়ে গেছেন।

ছাত্রাবস্থাতে বঙ্কিম এই সব আশ্চর্য প্রতিভাবানদের দলের মধ্যে এসে জুটতে পারেন নি; তিনি এসেছিলেন পুনরভ্যুত্থানের প্রথম জোয়ার কেটে যাবার পরে এই সব মহারথীর যুগ ও এখনকার দুর্বল অনুকরণকারীদের যুগের মাঝামাঝি সময়ে। তাঁর সমসাময়িক ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারিকানাথ মিত্র, যথেষ্ট কৃতী হ'লেও তবু এঁদের দ্বিতীয়ের পর্যায়েই স্থান দিতে হবে। বঙ্কিমই ছিলেন সেই যুগের শেষ মৌলিক প্রতিভা। তাঁর পর থেকেই জোয়ারটা একেবারে থেমে গেল, অতঃপর ভাঁটা শুরু হল। বঙ্কিমের পরে এলেন হেমচন্দ্র, নবীন সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এঁদের প্রতিভা অতি আশ্চর্য হ'লেও একেবারে মৌলিক নয়, শেলি এবং অন্যান্য ইংরেজ কবিদের প্রভাব যথেষ্টই ছিল এঁদের মধ্যে। অবশেষে এল কেশবচন্দ্র সেন ও কৃষ্ণদাস পালের যুগ; এঁদের ধর্মপ্রচারের গণ্ডীও খুব বেশি বিরাট নয় এবং সাহিত্যিক প্রতিভাও খুব বেশি উজ্জ্বল নয়, আর এঁরা শেষে সমাজসংস্কার নিয়ে মেতে উঠলেন। এটা অবশ্য ইংরেজেরই অনুকরণে, এঁদের না-জেনে রাজনীতিজ্ঞ হওয়া আর না-শিখে পণ্ডিত হওয়ার মধ্যে তেমন কিছু মৌলিকত্ব ছিল না। এঁদের আগেই নতুন উর্বরা জমির উৎকৃষ্ট ফসল ফলাবার প্রথম মরশুম কেটে গেছে, বাংলা তখন আবার ভবিষ্যতের উৎকৃষ্ট ফসল ফলাবার জন্যে অনাবাদী হয়ে প'ড়ে আছে। তখন এসে দেখা দেবে যাদের দল, তারা আবার এখানকার শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে দেখবে যে, নতুনের প্রেরণা নিয়ে আর কোনও নতুন জিনিস দেশকে তারা দিতে পারে কি না! অন্তত দু'বছর আগে পর্যন্ত আমাদের এই কথাই মনে হয়েছে যে, ইংলণ্ডের ষোড়শ শতাব্দীর ব্যাপারের মতো এ দেশেরও এই মহাজাগরণ অতঃপর ধর্মচর্চা ও মধ্যপন্থী রাজনীতির মধ্যেই বিলুপ্ত হতে চলেছে।

কিন্তু বঙ্কিমের ছাত্রাবস্থাতে হিন্দু কলেজের পূর্বেকার নামডাক তখনও পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ঐ হিন্দু কলেজ থেকেই যত নতুন নতুন প্রতিভার সৃষ্টি হয়েছে, নতুন যুগের মস্তিষ্ক ঐখান থেকেই প্রথম কাজ করতে শুরু করেছে, দেশের যুগনায়কদের নবীন হৃদয় ঐখান থেকেই প্রথম স্পন্দিত হতে আরম্ভ করেছে। বঙ্কিমের আমলে যাঁরা এসে জুটলেন, তাঁরা অনেকটা ধীর সংযত

শান্ত ভাব নিয়ে এসেছেন; কিন্তু তখনও তাঁরা আগের দলের আদর্শ নিয়ে আগেকার রীতিকেই অনুসরণ ক'রে চলেছেন। তাঁদের মতোই চিন্তাক্রিয়া ও পানক্রিয়ার দিকে বঙ্কিমও যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তা কেবল তাঁদের অনুকরণ করবার জন্যে নয়, যদিও অন্যান্য অনেকে ঠিক তাই করেছেন বটে, – কিন্তু প্রকৃতির দিক দিয়েও তাঁদের সঙ্গে বঙ্কিমের বিশেষ একটা মিল ছিল। খাঁটি ঔপন্যাসিকের যেমন হওয়া উচিত তেমনি তাঁর রুচিটা ছিল খুব উদার আর জীবনকে উপভোগ করার প্রতিও ছিল একটা তীব্র অনুরাগ; খাঁটি শিল্পী ছিলেন বলেই খুঁতখুঁতে মিতাচারী গতানুগতিক নিরীহ জীবন তিনি পছন্দ করতেন না। এমন কি দেশের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের দিকে তাঁর যখন মন টানল তখনও তিনি তাঁর আপন প্রকৃতি বজায় রেখেছিলেন, ধর্ম করতে হবে ব'লে যে বৈরাগ্যকেও স্বীকার করতে হবে – এ কথা তিনি কখনই মানেন নি। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের মনীষীরা অনেকে যেমন পানাদির বাড়াবাড়ি ক'রে নিজেদের প্রতিভাকে নষ্ট ক'রে ফেলেছিলেন, বঙ্কিম তেমন বাড়াবাড়ি কখনও করেন নি, যদিও "কোন মতে গণ্ডী ছাড়িয়ে যাব না" এমন সতর্ক মন নিয়েও তিনি চলতেন না। কেউ কেউ এমন মন্তব্য ক'রে থাকেন যে, অতিরিক্ত রকমের ভোগবিলাসই তাঁর অকালমৃত্যুর কারণ। হতেও পারে সে কথা; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে সঠিক সন্ধান না নিয়ে এ বিষয়ে কোনো নিশ্চিত অভিমত দেওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে আমরা যা-কিছুই অনুমান করব তার মধ্যে পক্ষপাতিত্বের দোষ এসেই পড়বে। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতো গোঁড়া সমাজসংস্কারক হয়তো সকল দোষটা এখনকার হিন্দু সমাজের উপরেই আরোপ করবেন; রাণাডের মতো গোঁড়া সংখ্যাবাদী হ'লে তিনি এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করতে আপন গাণিতিক পদ্ধতিতে পরিসংখ্যানের সমুদ্রমন্থন করতে বসবেন; আবার যাঁরা পাশ্চাত্য সভ্যতার গোঁড়া বিরোধী তাঁরা জোর গলায় বলবেন যে, এই সব অকালমৃত্যুর একমাত্র কারণ হ'ল এখনকার আমলের ভোগ-লালসা ও মদ্যপান। এ দিকে ডাক্তার ভাণ্ডারকর তাঁর মতের স্বপক্ষে অনেক বড় বড় নীতিবাদ আওড়াতে থাকবেন, অন্যদিকে রাণাডে আঁক ক'ষে দেখিয়ে দেবেন তাঁর নির্ভুল গণনা ও নিখুঁত যুক্তি, আবার ধর্মাভিমানীর দল এই সূত্রে আওড়াতে থাকবেন তাঁদের সংস্কারগত শুষ্ক উপদেশবাণী। পরস্পরের মধ্যে মতামতের অনেক তফাত হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে, একটা জায়গাতে কিন্তু সকলেরই মিল আছে, প্রকৃত সত্য কথাটা তাঁরা কেউ বলছেন না; কেবল সকলে আপন আপন মতের দিকের কথাই বিচার করছেন। যে ব্যাপারটাকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার ক'রে দেখতে হয়, তাই নিয়ে এই ভাবে তর্ক করতে বসলে তাতে সত্য কখনই প্রকাশ পায় না, বরং আরও বিভ্রান্তিই জন্মায়। আসলে আমাদের এই বাঙালী জাতির রক্তের মধ্যে রয়েছে ঐ ধরণের দুর্বলতা, তাই আমরা সেটাকে চাপা দেবার জন্যে উৎকট ধার্মিকতা ও গুরুগম্ভীর নীতিবাদের বচন যত পারি আওড়াতে থাকি; বঙ্কিমের মধ্যে যে দোষটুকু ছিল, তাকে অতিরঞ্জিত ক'রে দেখাতে গিয়ে আসলে আমরা আমাদের নিজেদেরই ভিতরকার দুর্বলতার বিরুদ্ধে নিজেদের সতর্ক করতে চাইছি; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে সে কৌশল খাটবে না। এটাও ভেবে দেখতে হবে যে, এখনকার উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালীর শরীরের ভাবগতিক এমনিতেই

থাকে যথেষ্ট ভঙ্গুর – অত্যাচার তাদের সহ্য হয় না। আর যারা সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামায়, তাদের ধাতের মধ্যে প্রায়ই এসে পড়ে মেয়েদের মত স্নায়ুদৌর্বল্য। কাঁচা অবস্থায় কারও মনকে যখন খুবই যত্নে রক্ষা করা দরকার, তখন যদি তার উপরে নির্দয়ভাবে অনেক রকম চাপ দিতে থাকা হয় আর একটা বিজাতীয় শিক্ষার নিগড়ে তাকে পীড়ন করা হয়, তার উপরে যদি আবার সেই শিক্ষার পদ্ধতিটাও বিকৃত হয়, সেই শিক্ষা গ্রহণ করতে প্রাণান্ত পরিশ্রমের পরেই যদি তাকে চাকরি নিতে বাধ্য হয়ে অস্বাস্থ্যকর জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াতে হয় আর জটিল মানসিক শ্রমে দিনরাত নিযুক্ত হতে হয়, এবং এর উপরেও যদি তাকে সাহিত্য রচনার জন্যে মস্তিষ্কচালনার দ্বারা আপন স্নায়বিক শক্তিটুকুকে ক্ষয় ক'রে ফেলতে হয়, তা হ'লে সেই ব্যক্তির ভগ্নস্বাস্থ্য ও অকালমৃত্যুর কারণ দেখাতে গিয়ে কখন যে সে মাঝে মাঝে একটু আধটু অত্যাচার করত তারই উপরে সমস্ত দোষটা চাপিয়ে দেওয়া সঙ্গত হবে না। সেখানে বরং আশ্চর্যের কথা এই হবে যে, লোকটি আরও আগেই মারা না গিয়ে এতকাল বেঁচে রইল কেমন ক'রে। বরং সেই কথা নিয়েই তখন বিবেচনা ক'রে দেখার দরকার হবে।

তবে এ কথা ঠিক যে বঙ্কিম তাঁর যৌবনকালের পারিপার্শ্বিক প্রভাবের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত যতই কেন হয়ে থাকুন, এদিকে ভাবসম্পদ ও মানসিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে অনেক বেশি লাভবান হয়েছিলেন – বস্তুত জীবনের প্রথম প্রেরণা তিনি ওর ভিতর থেকেই পেয়েছিলেন। বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল সর্বমুখী, অনেকটা তেলাঙয়ের মতো কিংবা তার চেয়েও বেশি। যাতেই তিনি হাত দিতেন, তাই তাঁর হাতে অপূর্ব রূপ নিয়ে গ'ড়ে উঠত। কিন্তু নিজের উপযোগী কাজের বদলে ভুল কাজেও তিনি মন লাগাতে পারতেন; আপন প্রতিভার উপযোগী প্রয়াসের দিকে না গিয়ে তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে অন্য কিছু কাজের দিকে ঝুঁকে নিজের ঐ প্রতিভাটিকে একেবারে নষ্ট ক'রেও ফেলতে পারতেন; তা হ'লে আজ আর তাঁর কোন কীর্তিই থাকত না। কে তাঁকে এই ভুল পথে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত ক'রে রেখেছিল? সে তাঁর সমসাময়িক ঐ উচ্চশিক্ষিত বাঙালীদের পরিবেশ এবং তাঁদের থেকে পাওয়া প্রেরণা; এমন মানুষদের সংস্রবের মধ্যে তিনি ছিলেন যারা প্রতিভা দেখলে তার কদর করতে জানে, সমুচিত উৎসাহ দিয়ে তাকে সেইভাবে উদ্দীপিত করতে জানে। মানুষের মতো গণ্ডীবদ্ধ প্রাণীর পক্ষে তার চারিপাশের প্রভাবটাই সব চেয়ে বেশি কাজ করে। প্রতিভা জিনিসটা অবশ্য কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে না, আপন তেজে তা আপনিই বেরিয়ে পড়ে; কিন্তু পরিস্থিতির আনুকূল্য সেটাকে আরও অনেকখানি সহজ ক'রে দেয়, তার মধ্যে একটা নৈমিত্তিক প্রবর্তনা এনে দেয়। তরুণ-মনের প্রথম উৎকর্ষের পক্ষে সেইখানেই হ'ল অনুকূল পরিবেশের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা – কেবল ইউনিভার্সিটির শিক্ষা এদিক দিয়ে বিশেষ কিছু সাহায্য করে না।

বঙ্কিমের বহুমুখী প্রতিভা

শ্রীঅরবিন্দ

খাঁটি সাহিত্যিক হয়ে সাংসারিক ব্যাপারেও কেউ যদি দক্ষতার প্রমাণ দেখায়, তা হ'লে লোকে বলে এ একটা অলৌকিক কথা। সাধারণ লোকের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, কাব্যপ্রতিভার সঙ্গে সাংসারিক বুদ্ধি জিনিসটা থাকতেই পারে না। অবশ্য সাধারণের অনেক ধারণাই এমনি অমূলক, তারা উপর থেকে গোটা কয়েক দৃষ্টান্ত দেখেই এমনি একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত ক'রে নেয়। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এ কথা ঠিক নয়, কারণ যদি একটু সহানুভূতি নিয়ে ধীরভাবে বিচার করা যায় তা হ'লে দেখা যাবে যে, বড়ো বড়ো মনীষী ও সাহিত্যিকদের মধ্যে দু-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশের প্রতিভার লক্ষণই হ'ল তাদের বহুমুখী শক্তি। যাদের ভালোরকম লেখবার ক্ষমতা থাকে তাদের অন্যান্য ক্ষমতাও ভালোরকম থাকে, বিশেষ ক'রে থাকে তাদের পর্যবেক্ষণশক্তি আর অনেক কিছু সৃষ্টি করবার শক্তি, যেমন দেখা যায় ঔপন্যাসিকদের মধ্যে। এর অনেক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন জার্মানির গ্যেটে, ইংলণ্ডের শেক্‌স্‌পিয়ার, ফীল্‌ডিং, ম্যাথু আর্নল্‌ড্‌ প্রভৃতি। সাংসারিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে যেখানে কর্মনৈপুণ্যের অভাব আছে মনে হবে সেখানেও ভাল ক'রে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, সে নৈপুণ্য ছিলই, কেবল অব্যবহারে তা মনের গুদামঘরে তালাবন্ধ থেকে মরচে ধ'রে গেছে। কবি ও গুণীজনেরা যে সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ হয়ে অসহায়ের মতো থেকে যায়, তার কারণ ঐভাবে থাকাটাই তারা পছন্দ করে; তাদের মানবপ্রকৃতির এই দিকটাকে তারা ইচ্ছা ক'রেই নষ্ট হয়ে যেতে দেয়, যাতে সম্পূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাটে তারা নিজেদের কল্পলোকে বিচরণ করতে পারে; তাদের মোমবাতির দু দিকে দুটো মুখ আছে ব'লেই তারা একটা মুখ ছেড়ে দিয়ে কেবল অপর মুখটাকেই সর্বদা জ্বালিয়ে রাখে। বঙ্কিম ছিলেন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের

অন্যতম, তাই তাঁর ছিল বহুমুখী প্রতিভা, তা সব দিক দিয়েই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশও পেয়েছিল। একটিমাত্র মগজের মধ্যে তাঁর প্রতিভার সকল গুণ একসঙ্গে ঠাসা ছিল, তাই একাধারে তিনি ছিলেন পণ্ডিত, কবি, প্রবন্ধকার, ঔপনাসিক, দার্শনিক, আইনজ্ঞ, সমালোচক, শাসক, ভাষাতত্ত্ববিদ্, ধর্মার্থ বিচারক ইত্যাদি অনেক কিছু। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে যে, তাঁর এই সব গুণের কোনোটার সঙ্গে কোনোটার সঙ্গতি নেই। তাঁর ভাষাশিল্পের দিকে যেমন টান, তেমনি আবার আইনের নিখুঁত বিচারের দিকেও টান; সরকারী নথিপত্র লিখতে জানেন রীতিমত মুন্সিয়ানার সঙ্গে, আবার সাহিত্যিক প্রবন্ধও লেখেন অতি চমৎকার; নিরীহ ভালো ছেলের মতো পরীক্ষাও পাস করেন, আবার শাসকের বজ্রমুষ্টিতে অত্যাচারী দস্যুদেরও দমন করেন; দর্শনের অতি জটিল সমস্যা নিয়েও নাড়াচাড়া করেন, আবার শব্দরচনার অতি সুক্ষ্ম সমস্যা নিয়েও লেগে যান; জীবনের উপভোগাদির কথাটাও বোঝেন ভালো, আবার আধ্যাত্মিকের দিকটাও কম বোঝেন না; নীরস ব্যাকরণও রপ্ত ক'রে নেন, আবার সরস কবিতারও সৃষ্টি করেন।

কিন্তু এমন বহুমুখী প্রতিভা থাকলে আমরা কি করতাম? তারই গর্বে বিস্ফারিত হয়ে আমরা সকল দিক দিয়ে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে কি অসংকোচে সকল ব্যাপারেই বিদ্যা ফলাতে যেতাম? তাতে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখানো হ'ত বটে, কিন্তু সেটা নিতান্তই ভুল কাজ করা হ'ত। প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতাগুলি নিয়ে সকল ক্ষেত্রেই তাকে সমানভাবে প্রয়োগ করতে গেলে তুমি আপন বৈশিষ্ট্যটুকু নিশ্চয় হারিয়ে ফেলবে। বঙ্কিম এতটা ভুল কাজ কিছু করেন নি। তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কেবল সাহিত্যে, অর্থাৎ গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে, এ কথা তিনি খুবই জানতেন। তাঁর গীতিকাব্য রচনাও মনোরম ছিল, কিন্তু তার সংখ্যা নিতান্তই কম; দর্শনতত্ত্বও তাঁর প্রিয় ছিল, কিন্তু তাই নিয়ে লিখেছেন তিনি কেবল শেষ জীবনে; আইনবিদ্যাও তাঁর প্রিয় ছিল, কিন্তু তা নিয়ে চর্চা করেছেন কেবল প্রথম জীবনে; এদিকে যা-কিছু পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক জ্ঞান তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন সমস্তই কাজে লাগিয়েছিলেন তাঁর অনুপম সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে, জগতের সকল শ্রেষ্ঠ লেখকই যা ক'রে থাকেন। তাই অপূর্ব বর্ণ-বৈচিত্র্যে ও নানাবিধ জ্ঞানসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে তাঁর লেখাগুলি নানা বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিতে পেরেছে। এই গদ্য-সাহিত্যের ভিতর দিয়েও তিনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভাকে নানাভাবে প্রকট করতে পারতেন, কিন্তু তা না ক'রে তিনি আপন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই সব-কিছুকে সীমাবদ্ধ রাখলেন। নিজের ভূমি ছেড়ে অন্য ভূমিতে বিচরণ করতে কখনই তিনি যান নি। যখনই দু-একবার অপর ভূমিতে পা দিয়েছেন তখনই বুঝতে পেরেছেন যে, তিনি অনর্থক শক্তিক্ষয় করছেন। কেবল এক জায়গায় তাঁকে এমনি অযথা শক্তিক্ষয় করতে বাধ্য হতে হয়েছিল, সে তাঁর চাকরির কাজে। ভারতের দুর্ভাগা মধ্যবিত্তদের জীবন এমনই অসহায় যে, তার মধ্যে কেউ প্রতিভা নিয়ে জন্মালেও বাঁচবার জন্যেই তাকে আত্মহত্যা করতে হয় – হয় চাকরি, না হয় আইনজীবীর কাজ তাকে বেছে নিতে হয়। অর্থাৎ হয় বিষ খেয়ে মরো, নয়তো বুকে ছুরি বসিয়ে দাও। আরও যে-সব পেশা আছে তার মধ্যে শিক্ষা-বিভাগের কাজে খানিকটা ছুটির ফাঁক

পাওয়া যায়, আর আছে এই শাসন-বিভাগের কাজ, তাতে প্রত্যক্ষভাবের পরিবর্তে পরোক্ষভাবেই মনের উপর জুলুম চলে ব'লে প্রতিভা নষ্ট হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। কিন্তু বর্তমান সময়ে নানারূপে প্রয়োজনের চাপে তাতেও অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

বঙ্কিমের যে বহুমুখী তৎপরতা ছিল তা হ'ল শিক্ষিত হিন্দুর পক্ষে একটা সাধারণ লক্ষণ। যদিও একে এক হিসাবে সৌভাগ্য আর এক হিসাবে দুর্ভাগ্য বলতে হবে, কিন্তু এই ছিল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের একটা বিশেষত্ব। পুরুষ-পুরুষানুক্রমে এটা আমাদের রক্তের মধ্যে চ'লে এসেছে, আগেকার লোকেরা গত তিন হাজার বছর ধ'রে যে ভাবে বুদ্ধিবৃত্তিকে শান দিয়ে এসেছেন এটা তারই ফল। কিন্তু এতে একটা মস্ত দোষ এসে পড়ে, কারও প্রতিভাকে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে তার পক্ষে এই বহুমুখিতাকে অতি সাবধানে দাবিয়ে চলতে হয়। যেটা আমার বিশেষ বৈশিষ্ট্য কেবল সেটাকেই আঁকড়ে ধ'রে থাকব, প্রতিভার পক্ষে এটা খুব জাঁকের কথা না হতে পারে; কিন্তু এই হ'ল জীবনের সোজা নিয়ম আর এই হ'ল বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা কিন্তু সকল বিষয়ের দিকেই ঝুঁকে সমান কৃতিত্ব দেখাতে চাই; একবারও ভেবে দেখি না যে, মন জিনিসটারও ক্ষয় আছে, অন্যান্য জিনিসের মতো এরও ভার সইবার একটা সীমা আছে। এ কথা ভুলে যাই যে, কেবল বিশিষ্ট বৃত্তির চর্চাতেই নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা আসতে পারে; তা ছাড়া আমাদের শক্তির ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়, সব দিক থেকে খরচ করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত জমায় এসে টান পড়ে। এই সব কথা না বুঝে আমরা মোমবাতিটার দুই মুখই সমানে জ্বালিয়ে রাখতে চাই। আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এই প্রচেষ্টা দেখা যায়, সে যেন সব দিক থেকে মানুষকে মাড়াই করবার অমোঘ যন্ত্র; এ যন্ত্র কেবল মানুষটাকেই বধ করে না, এর উৎপত্তি হয়েছে মানুষের আত্মাটিকে বধ করবার জন্যে; তার জীবনের চেয়েও বেশি দামী তার ভিতরকার ব্যক্তিত্বের যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সেইটিকে একেবারে নিবিয়ে দেবার জন্যে। কাশীনাথ তেলাঙের সাহিত্যিক প্রতিভারও এমনি মারাত্মক পরিণতি ঘটেছিল। নানারকম দুর্লভ গুণের অধিকারী হয়েও, এবং এক উদীয়মান জাতির নিতান্ত বাঞ্ছনীয় প্রতিভার অধিকারী হয়েও তিনি যে জগতে স্থায়ী রকমের কোনও কীর্তি রেখে যেতে পারলেন না, শিক্ষার এই মাড়াই যন্ত্রই হ'ল তার অন্যতম কারণ। তেলাঙ প্রধানত ইংরেজী ভাষাতেই যা-কিছু লিখতেন, কারণ সেই বিদ্যাই তাঁকে শেখানো হয়েছিল। কিন্তু পরের দেশের ভাষা তুমি যতই ভালো ক'রে শেখ, সে ভাষায় যতই ভালো তুমি লিখতে পার, তোমার প্রতিভার তাতে সম্পূর্ণ বিকাশ হতে পারবে না। তিনি আরও এক মস্ত ভুল করেছিলেন, এই যে, নিজের বৈশিষ্ট্যকে সার্থক হতে তিনি সুযোগ দেন নি; যদিও তাঁর স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল সাহিত্যসৃষ্টির দিকে, যা তাঁর লেখার দিকে একটু লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, তবু তিনি ঠিক ঐ জিনিসটাকেই বাদ দিয়ে অন্যান সকল দিকে অযথা তাঁর শক্তিক্ষয় করেছিলেন। এ বিষয়ে বঙ্কিমকে যথেষ্ট ভাগ্যবান বলতে হবে। তিনি লিখতে শুরু করলেন তাঁর নিজেরই সুমধুর মাতৃভাষার মাধ্যমে, আর সাহিত্যসৃষ্টির দিক দিয়েই তাঁর সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করলেন, যদিও এটা ঠিক কথা যে তাঁর যা অসাধারণ মৌলিকত্ব ছিল তা যে-কোনো দিক দিয়েই হোক ফুটে বেরিয়ে আসত। তবে তাঁর জীবনের চাকরিবাধ্যতা

না থেকে যদি তিনি নির্বিবাদে এই কাজ ক'রে যাবার অবসর পেতেন, তা হ'লে এর চেয়েও আরো কত বহুমুল্য জিনিস তিনি যে আমাদের দিয়ে যেতে পারতেন সে কথা মনে করলে দুঃখ হয়। প্রায় চল্লিশটি বছরের সাহিত্যসেবার ফলে তিনি আমাদের জন্যে রেখে গেছেন দশখানি উপন্যাস, ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ-পুস্তক, এবং আরো কিছু অন্যান্য ধরণের সাহিত্য। তাঁর এই অবদানগুলি সংখ্যায় কম হলেও ওজনে ভারী খাঁটি সোনা। আর এমনও হতে পারে যে, এর চেয়ে বেশি সুযোগ থাকলেও তিনি এর চেয়ে বেশী কিছু লিখতে পারতেন না। প্রকৃতির রাজ্যে তুচ্ছ কাচ পাথর আর মিশাল ধাতুর টুকরো অনেক জায়গাতেই মেলে আর প্রচুর পরিমাণেই মেলে, কিন্তু খাঁটি সোনা মেলে মাত্র বিশেষ বিশেষ জায়গাতে আর তাও অতি অল্প পরিমাণে।

বঙ্কিমের সাহিত্য-জীবনের ইতিহাস

শ্রীঅরবিন্দ

বঙ্কিমের জীবনে রীতিমত সাহিত্যসেবা প্রথম শুরু হয় খুলনায় থাকতে, যদিও আগে ছাত্রাবস্থাতে তিনি মাঝে মাঝে কবিতা লিখতেন। সে সময়ে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দুটি সাময়িক পত্রিকা বের করেছিলেন – 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সাদুরঞ্জন'। তাতে দ্বারিকানাথ ও দীনবন্ধু মিত্র দুজনেই ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণে ছাত্রজনোচিত ভাবে অনেক কিছু লিখতেন। বঙ্কিমও তখন তাঁদের দলে যোগ দেন, কিন্তু গোড়াতেই তাঁর মৌলিক ধরণের রচনাদি দেখে সূক্ষ্মদর্শী ঈশ্বরচন্দ্র এই অপরিচিত ছাত্রটির মধ্যে প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় পেয়ে যান।

মধুসূদন দত্তের মতো বঙ্কিমও একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রথম ইংরেজী ভাষাতেই লিখতে শুরু করেছিলেন, সব-প্রথম তিনি 'রাজমোহনের স্ত্রী' নামে একটি ইংরেজী উপন্যাস লেখেন। কিন্তু পরে মধুসূদনের মতোই তিনি নিজের ভুল নিজে বুঝলেন। তিনি বুঝলেন, প্রত্যেকে যেমন কথা বলার বেলাতে স্বাভাবিকভাবে শেখা নিজের মাতৃভাষাতেই সবচেয়ে সহজে বলতে পারে, তেমনি লেখার বেলাতেও সেই ভাষাতেই সে নিজেকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারে, তাতেই সে পরিপূর্ণভাবে ও জোরের সঙ্গে নিজের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে পারে। যতই অবহেলা করুক, যতই ভুলে যাক, তবু নিজের মাতৃভাষার উপর তার একটা জন্মগত দখল থাকবেই। কাজেই সেই ভাষাতেই সে পরম নিশ্চিন্তে লিখে যেতে পারবে, আর কোনও মৌলিকতা থাকলে তাও অনায়াসে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। অন্য কোনও শেখা ভাষাতে লিখে সে মৌলিকতাকে ফুটিয়ে তোলা প্রায় অসম্ভবে গিয়ে দাঁড়াবে। কারণ মনটা সর্বদাই তার আপন নিগূঢ় অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে থাকে, তখন সেই ভাবটাই একটা গুরুভার বোঝার মতো চেপে থাকে, কাজেই সে তখন নিজের অজানিতে পরের নকল

করবার দিকেই ঝোঁকে, নতুবা নিজের ভাবটিকে নষ্ট ক'রে ফেলে, এবং যা-কিছুই সে রচনা করে তা একটা খেলো ধরণের জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তা হবে একটা অস্বাভাবিক বা ভেজাল জিনিস, মুখের মধ্যে পাথর ভ'রে নিয়ে কথা বললে যেমন শোনায় কিংবা কাঠের পা নিয়ে চলতে থাকলে যেমন দেখায় তেমনি। বঙ্কিম ও মধুসূদনের যথেষ্ট মৌলিকতা থাকা সত্ত্বেও ইংরেজীতে লিখতে যাওয়া যে ভুল – এ কথা দুজনেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মধুসূদন তাঁর 'ক্যাপটিভ লেডি' লেখার পর আর দ্বিতীয় কোনও ইংরেজী কাব্য লিখলেন না, বঙ্কিমও তেমনি তাঁর 'রাজমোহনের স্ত্রী' লেখার পর দ্বিতীয় কোনও ইংরেজী উপন্যাস লিখলেন না।

বঙ্কিম প্রথম উপন্যাস লিখতে শুরু করেন খুলনায়, আর সেই প্রথম উপন্যাসটি শেষ করেন বারুইপুরে। সেখানে থাকতেই আরও কিছু উৎকৃষ্ট জিনিস তিনি লেখেন। তাঁর সেই প্রথম উপন্যাস হ'ল 'দুর্গেশনন্দিনী', যা নতুনতর বাংলা গদ্য-রচনার প্রথম নিদর্শন হিসাবে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। ঐ বারুইপুরে থাকতেই তিনি আরও লিখলেন 'কপালকুণ্ডলা' এবং 'মৃণালিনী', এবং তার পরে শুরু করলেন তাঁর সেই বিখ্যাত 'বিষবৃক্ষ'। বহরমপুরে গিয়ে তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটির সম্পাদনা শুরু করেন। এতে চারিদিকে বাংলা রচনা সম্বন্ধে একটা সাড়া প'ড়ে গেল, তাঁর দেখাদেখি পরে আরও অনেক সাহিত্য-পত্রিকার আবির্ভাব হ'ল, এবং তার আদর্শ নিয়ে আরও উন্নত ধরণে প্রকাশিত হ'ল প্রগতিশীল ঠাকুর-বাড়ির সাহিত্য-পত্রিকা 'ভারতী'।

যাই হোক, এর পর থেকে বঙ্কিম একে একে আমাদের দিতে থাকলেন তাঁর পরিণত লেখনীর অমর কীর্তিস্বরূপ তাঁর 'চন্দ্রশেখর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'দেবী চৌধুরাণী', 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম', 'ইন্দিরা' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর'। বহরমপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের পদে কাজ করবার সময় থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকল, তার থেকে তিনি কখনই আর সেরে উঠতে পারলেন না, মৃত্যু পর্যন্ত সেই ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে। কিন্তু দৈহিক অসুস্থতাকে তুচ্ছ ক'রে সাহিত্যের সাধনাতে বরাবরই তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে গেছেন। জীবনের শেষের কয়েকটি বছর তিনি সর্বক্ষণ কষ্ট ভোগ করেছেন, তবু সেই কয় বছর ধ'রেই তিনি আরও বেশী সাফল্যের সঙ্গে অনবরত লিখে গেছেন। তিনি যৌবনে ছিলেন ভোগী, পরিণত বয়সে ছিলেন আমোদপ্রিয়। জীবনের আনন্দবিলাস ও সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে স্বভাবতই একটা শিল্পীজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গী থাকায় তিনি কঠোরব্রতী সন্ন্যাসীর আদর্শকে কখনই ভাল ব'লে স্বীকার করেন নি আর উৎকট ধর্মনিষ্ঠাকে অবজ্ঞার চোখেই দেখে এসেছেন। কিন্তু এখন জীবনের অপরাহ্নকালে যখন মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে এল, তখন তাঁর অন্তরাত্মা শাশ্বতের অবলম্বন খুঁজতে ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিল। তাই শেষের উপন্যাসগুলিতে দেখা যায়, উত্তরোত্তর দার্শনিকতার দিকে তাঁর একটা টান, এবং শেষকালে শিল্পীর আসন ছেড়ে দার্শনিক চিন্তাধারা নিয়ে তাঁকে দার্শনিকের স্থানে উঠে দাঁড়াতে হ'ল। অসহ্য দৈহিক যন্ত্রণা নিয়ে তিনি ভগবদ্‌গীতা ও বেদ পাঠে নিজেকে নিমগ্ন করলেন এবং সেই সব অমূল্য ভাণ্ডার থেকে দুর্লভ রত্নরাজি

সংগ্রহ করতে থাকলেন, আর দেশবাসীদের হাতে তাদের ভাষায় সেই সব জিনিস তুলে দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন। তাই তিনি লিখলেন 'কৃষ্ণচরিত্র' ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও এক গ্রন্থ। ভগবদ্‌গীতা ও বেদের বাংলা ভাষ্য প্রস্তুত করা ছিল তাঁর অন্তিমের বাসনা। গীতার তিনটি অধ্যায় তিনি শেষ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু বেদের ভাষ্য করার সংকল্প তাঁর সফল হতে পেল না; তা যদি ক'রে যেতে পারতেন, তা হ'লে আমাদের কাছে তা এক অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকত। মৃত্যু ইতিমধ্যে দ্বারে এসে অপেক্ষা করছিল, সে তাঁর হাত থেকে কলমটি কেড়ে নিলে, সেই অপূর্ব প্রতিভার শেষ লেখাটা আর লিখে যেতে দিলে না। তবে যে দশটি অমূল্য রত্ন তিনি রেখে গেছেন, আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। দশজন আলাদা আলাদা খ্যাতিমান পুরুষের সম্মিলিত খ্যাতির চেয়েও তাঁর একার খ্যাতি তাতেই অনেক বেশি, এবং সে খ্যাতি চিরদিন অমর হয়ে থাকবে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের স্থান

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের স্থান কোথায় সে কথা বলা আদৌ কঠিন নয়; গদ্য-সাহিত্যে তাঁর সমতুল্য কেউই নেই, কেবল কাব্য-সাহিত্যে রয়েছেন একজন, যিনি তাঁর কাছাকাছি দাঁড়াতে পারেন। তবে ইংরেজী ভাষায় শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে গেলে সেখানেই কাজটা কিছু কঠিন হবে; কিন্তু আমার মতে কেবল একজন ছাড়া অন্য সকলেরই চেয়ে বঙ্কিমের স্থান উঁচুতে; কোনও কোনও বিশেষ গুণে বঙ্কিমের চেয়ে তারা বড় হতে পারে, কিন্তু মোটের উপর সব দিক দিয়ে বিচার করলে বঙ্কিমই হবেন শ্রেষ্ঠ, আর বিশেষতঃ একটা কথা এই যে তিনি হলেন সকলের চেয়ে নিখুঁত ও নিটোল শিল্পী। জীবনের ইতিহাসের দিক দিয়ে, ভাগ্যের দিক দিয়ে আর চরিত্রেরও দিক দিয়ে এঁর সঙ্গে অনেকখানি মিল দেখা যায় ইংরেজী উপন্যাসের জনকস্বরূপ হেন্‌রি ফীল্‌ডিংয়ের সঙ্গে, তবে সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে এঁরা দুজনে দুই বিভিন্ন স্তর থেকে কাজ ক'রে গেছেন। বঙ্কিমের রচনার মধ্যে পাওয়া যায় একটা দার্শনিক ইঙ্গিত, জীবনের সম্বন্ধে একটা সুগভীর কাব্যদর্শী মনোভাব, একটা সুস্পষ্ট সৌন্দর্যবোধ; ফীল্‌ডিংয়ের লেখার মধ্যে এ জিনিস নেই। বঙ্কিমের সঙ্গে স্কটের তুলনা করা আজকাল একটা ধুয়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে, অনেকেরই মুখে শোনা যায় যে বঙ্কিম নাকি বাংলার স্কট। তারা মনে করে যে, এতে বুঝি তাঁকে খুব একটা উচ্চ গৌরবের স্থানে তুলে দেওয়া হ'ল, এটুকু বুঝতে পারে না যে তাঁকে বরং এতে যথেষ্ট অপমানিতই করা হয়। বহু ত্রুটিপূর্ণ ও অপরিণত শক্তির একজন স্কচ লেখকের সঙ্গে কি পরম শক্তিশালী মৌলিক প্রতিভার তুলনা করা চলে? স্কটের অবশ্য অনেকগুলি অসাধারণ গুণ ছিল, কিন্তু আবার দোষত্রুটিও যথেষ্ট ছিল। তাঁর লেখনভঙ্গীতে তেমন দৃঢ়তার ছাপ ছিল না; অনুপ্রেরণার জোরে অনেক জায়গায় খুব ভালোই লিখেছেন, কিন্তু বাকি সব জায়গাতে দেখা যায় যে তাঁর লেখার মধ্যে নিজস্ব কোনও রচনাশৈলী নেই; ঘটনা-বর্ণন করবার শক্তি যতই থাক, কিন্তু প্রকৃত রসবোধের অভাব থাকায় তার মোট ফল বিপরীত হয়ে দাঁড়িয়েছে; তাঁর

উপন্যাসের যে চরিত্রগুলির দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষিত হবার কথা, সেগুলি অধিকাংশই যেন সাক্ষীগোপালের মতো, তার মধ্যে তেমন সত্যিকার প্রাণের সাড়া নেই; কেবল বাইরের দিক থেকেই মনে হতে পারে যে তারা উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে, কিন্তু ভিতরের দিক থেকে নয়। স্কট কেবল রেখাচিত্রটাই এঁকে যেতে পারতেন, সেই রেখাগুলোকে রঙ দিয়ে সুন্দরভাবে ভরাট ক'রে দিতে পারতেন না। এখানে বঙ্কিম তাঁকে অতিক্রম ক'রে গেছেন; তাঁর লেখার মধ্যে ঘটনা ও সংলাপ এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়ে গভীর অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, তাতেই পুরুষ ও নারী-চরিত্রগুলিকে অবিকল রক্তমাংসের মতো দেখাচ্ছে। এছাড়া তাঁর প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে যে প্রাণলক্ষণ ও কাব্যসুষমা সহজ প্রাচুর্যে উপছে উঠেছে, তা ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে কেবল ব্রন্‌টি ভগ্নীদ্বয়ের রচনায় ও জর্জ মেরিডিথের লেখাতে ছাড়া অন্য কোথাও মেলে না। নারীচরিত্রের মধ্যে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকা নাট্যকারের পক্ষে এক বিশেষ গুণ, বঙ্কিমের মধ্যে এই গুণটিও ছিল। অন্য লেখকের কোনও উপন্যাসের মধ্যে যতই খুঁজে দেখ, বঙ্কিমের উপন্যাসের জীবন্ত নারীচরিত্রের মতো আর কোথাও মিলবে না। এমন কি, খুব প্রতিভাবান ঔপন্যাসিকের বেলাতেও দেখা যায় যে, তারা নারীচরিত্রের অন্তরে ঢুকতে পারে না, বাইরে পর্যন্ত পৌঁছেই থেমে যায়। এ বিষয়ে ফীল্‌ডিংয়েরও হার হয়েছে; স্কটের নায়িকারা তো যেন কতকগুলি মোমের পুতুল, এমন কি তাঁর শ্রেষ্ঠা নায়িকা রেবেকা অতিরিক্ত-রঙ-চড়ানো একটা কাঠের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়; এমন কি বহুখ্যাত থ্যাকারের লেখার মধ্যেও জীবন্ত নারী মেলে মাত্র তিনটি কি চারটি। চূড়ান্ত নাট্যপ্রতিভা যাঁদের ছিল তাঁরাই কেবল নারীদের অন্তরের গুপ্তরহস্য ভেদ করতে পেরেছেন। শেক্‌স্‌পীয়রের এই গুণটি ছিল পূর্ণ মাত্রায়, বর্তমান শতাব্দীর মধ্যে ছিল মেরিডিথের আর ছিল আমাদের দেশে বঙ্কিমের।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চশমা-চড়ানো সংস্কারকামীর দল হিন্দুদের জীবনের নগণ্য উপাদানবস্তু ছাড়া উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই দেখেন না, আর নারীচরিত্রের মধ্যে দেখেন কেবল হীন আনুগত্য বৃত্তি, তাদের মধ্যে আছে কেবল সংকীর্ণতা ও অপার অজ্ঞতা। কিন্তু বঙ্কিম তাঁর কবির দৃষ্টি নিয়ে তাঁদের মধ্যেই অনেক গভীরতম সম্পদের আবিষ্কার করতে পেরেছেন। এ দেশের মানুষের জীবনেও যে কতখানি মাধুর্য ও চমৎকারিত্ব থাকতে পারে, এখানকার নারীদেরও হৃদয়েও যে কত প্রেম ও মহিমা লুকিয়ে থাকে, কত গভীর যে হতে পারে তাদের হৃদয়াবেগ, কতই যে তাদের মনের দৃঢ়তা, কোমলতা, কমনীয়তা, অনির্বচনীয়তা, তা তিনি তাদের অন্তরে প্রবেশ ক'রে দেখেছেন; আর সেই সব কথা তাঁর শিল্পী-কবির অমর তুলিতে দিব্য চিত্রে আঁকা হয়ে উপন্যাসগুলির পাতায় পাতায় অম্লান হয়ে ফুটে আছে। আমাদের দেশের সংস্কারকামীদের পক্ষে সেই সব কথা বঙ্কিমের লেখা থেকে শিখে নেওয়া উচিত। সংস্কার এনে ফেলবার অদম্য উৎসাহে তাঁরা এ দিকটা একবারও ভেবে দেখেন না, বোকা দরজীরদের মতো দামী কাপড়টাকে কেটে ছেঁটে কেবল আধুনিক চেহারাটার সঙ্গে মাপসই করতে চান, ভবিষ্যতেও সে মাপে কাজ চলবে কি না তার দিকে কোনও খেয়াল নেই। দেশের

আগেকার ছাঁচের বদলে তাঁরা হাল বিলাতী ছাঁচে মেয়েদের ঢালাই করতে চাইছেন, কিন্তু আগেকার ছাঁচে তবু কিছু দামী জিনিসের সাক্ষাৎ পাবার সম্ভাবনা ছিল, আর এখন কার ছাঁচে যা দাঁড়াচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে কেবল অন্তঃসারশূন্য কতকগুলি চটুল মানবী, যারা পারে ভড়ং করতে, পুরুষ ভোলাতে আর পিয়ানো বাজাতে। এমনি ক'রে সংস্কারের নামে দেশের সব-কিছু দুর্মূল্য জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমন সংস্কার অবিলম্বে থামিয়ে দেওয়া উচিত। মানব-আত্মার যে স্বাভাবিক দিব্য মহিমা, তাকে এই ভাবে নষ্ট না ক'রেও তো অনেক বৃহত্তর বিস্তারের পথ উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে সেই জিনিসেরই আরও উৎকর্ষ সাধন করা যায়। আমাদের দেশের মেয়েরা তা হ'লে প্রাণের ও জ্ঞানের দুই দিক থেকেই মনোরম ও মহীয়সী হতে পারে, এবং কতকগুলি হীনমতি ও অর্থলোলুপ সন্তানের মা হওয়ার বদলে জ্ঞানী, গুণী ও বীর সন্তানের মা হতে পারে।

বঙ্কিমের রচনাশৈলীর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে। তাঁর লেখার ভিতরকার যে অনবদ্য সৌন্দর্য, তাঁর ভাষার ছন্দে একাধারে যে দৃপ্ত বীর্য ও পরিপাটি মাধুর্য, আমার লেখনীর ভাষা তার সম্যক পরিচয় দিতে সক্ষম নয়। কেবল এইটুকুই আমি বলতে পারি যে, বঙ্কিমের নিখুঁত ও গভীর সৌন্দর্যবোধই তাঁকে সকলের চেয়ে বড় ক'রে তুলেছে। বাংলা ভাষার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হ'ল সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারা, আর ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষার এই গুণটাই আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে যে সব অসন্তষের কল্পনা থাকত – যেমন রামচন্দ্রের বানর-বাহিনী কথা, রাবণের দশমুণ্ডের কথা – সে সব জিনিস এখানকার সাহিত্যের পক্ষে একেবারে অচল হয়ে গেছে। কিন্তু কল্পনার ফুল ফোটানোর দিক দিয়ে কিংবা মানুষের হৃদয়মাধুর্য প্রকাশের দিক দিয়ে তখনকার দিনের 'শকুন্তলা' থেকে আমরা যতখানি আস্বাদ পেয়েছি, এখনকার বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা' ও 'বিষবৃক্ষের' মধ্যে তার চেয়ে কিন্তু কম নেই।

বাংলার জন্য বঙ্কিম কি করেছেন

শ্রীঅরবিন্দ

ইতিপূর্বে বঙ্কিমের কীর্তির কথা কেবল সাহিত্যের দিক থেকেই বলেছি। এবার বলতে চাই তার ঐতিহাসিক মূল্যের কথা, বাংলা ভাষার উপর ও বাঙালী জাতির উপর তা কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে সেই কথা। সে কথা বলতে গেলে একটু অতিপ্রশস্তির ভাষা প্রয়োগ করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। এর আগে একবার আমি বলেছি যে, বর্তমান বাংলা ভাষাকে তিনি নতুন রূপ দিয়ে সৃষ্টি ক'রে গেছেন, কিন্তু তাতে কোন অতিশয়োক্তি হয় না। এঁদের দুজনের আবির্ভাব হবার আগে বাংলা ভাষার সুরটি যদিও মধুর এবং মনোরম ছিল, কিন্তু তা ছিল যেন একতারা যন্ত্রের একটানা সুরের মতো। শুধু প্রাচীন কবি ভারতচন্দ্র ছাড়া অন্য কোনো প্রতিভাশালী ওস্তাদ এ যন্ত্র নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া করেন নি; গদ্য-সাহিত্যের মধ্যে কেবল বেতালপঞ্চবিংশতি ও বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান ছাড়া বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ছিল না, আর বাংলা কাব্যগুলিরও মধ্যে সেই একটানা মাধুর্যরস ছাড়া আর বিশেষ কিছুই মিলত না। পৌরুষের দৃঢ়তা, সুক্ষ্মতা, প্রসারতা, বিচিত্রতা এ সব কিছুই তার মধ্যে মিলত না। তার পরে দেখা দিলেন মধুসূদন ও বঙ্কিম, গ্রীক কবি টারপেণ্ডার এবং অর্ফিয়াসের মতো অবতীর্ণ হয়ে তাঁরা সেই একতারা যন্ত্রটিতে বাঁধলেন নতুন নতুন তন্ত্রী। যে ভাষা ছিল এককালে নুয়ে পড়া ধরণের নারীভাষ্য, মধুসূদনের হাতে তাই হয়ে উঠল এক তেজোদৃপ্ত দেবভাষা, তাই হ'ল বীরত্বব্যঞ্জক মহাকাব্যের ভাষা, যাকে মাধ্যম ক'রে দুর্দাম ঝড়ঝঞ্জাও নিজেদের বক্তব্যগুলি বজ্রনিনাদে ব'লে যেতে পারে; সমুদ্রগর্জনের অনুকরণে এই ভাষাতেও তিনি তাঁর পরমাশ্চর্য বাগ্‌বিন্যাস ক'রে সকলকে চমৎকৃত করতে থাকলেন। সেই বাংলা ভাষাকে এক অপূর্ব গরিমময় রূপ দিয়ে তিনি মানব-অন্তরের তীব্র জ্বালাময় আবেগরাজিকেও সম্পূর্ণ সার্থকতার সঙ্গে চিত্রিত ক'রে দেখিয়ে

দিলেন। মিলটনের শয়তানের মুখে যেমন তেজোগর্ভ বচনবিন্যাস শোনা গেছে, সেই রকমই সতেজ ও সবল বচনবিন্যাস মধুসূদনের কাব্যের ছত্রে ছত্রে দেখা যেতে লাগল। কিন্তু তার পরে বঙ্কিমের হাতে সেই আগেকার অস্ফুট ও দুর্বল ভাষা গদ্যতেও হ'ল সতেজ, সমৃদ্ধ, অপূর্ব গীতিমুখর ও নমনীয়, আর হ'ল মানুষের সব-কিছু কোমল বৃত্তির এবং সুন্দর কিংবা মহৎ ভাবধারা প্রকাশের উপযোগী। এখানে অবশ্য আমি এমন কথা বলতে চাইছি না যে, বঙ্কিম ও মধুসূদনের পূর্ববর্তিগণ এই সকল ক্ষেত্রে কোনো কিছুই করেন নি। দেবতারা যে পথে চলবেন সে পথের প্রথম সূচনা আগে থেকেই করা হয়ে থাকে, জমিটা আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকে। অনেক বড় বড় গুণী ব্যক্তি আগে থেকেই এ বিষয়ে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের যথেষ্ট উচ্চ আদর্শ থাকলেও তা এই ভাষার মাধ্যম ততটা সফল হতে পারে নি। রামমোহন রায়, চিরস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ও বাঙালী নাট্যকারগণ সকলেই দেশের সাহিত্য নিয়ে উচ্চ আদর্শের পথে চলতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর যতই জ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী হোন, তিনি শিল্পী ছিলেন না, অক্ষয়কুমার দত্ত যা-কিছু লিখতে তা কেবল তাঁর সাময়িক পত্রিকার পাঠকদের কাছেই আদর পেত; বাকি সকলের প্রকৃত সাহিত্যিক মৌলিকতা বিশেষ কিছু ছিল না। ভাষাকে প্রাণ দিতে ও তার রূপান্তর আনতে হ'লে যাদুকরের মতো একটা যে সহজাত শক্তি থাকা দরকার সেই শক্তি এঁদের মধ্যে কারুরই ছিল না।

বঙ্কিমের এমন এক বিশিষ্ট প্রতিভা ছিল যার জোরে তিনি বাংলা দেশের প্রাদেশিক বুলিকে এক জগদ্বরেণ্য ভাষায় পরিণত করতে পেরেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার ফলে লোকের মনে এমন একটা ধারণা এসে গিয়েছিল যে ইংরেজীর সব-কিছুই ভাল, বাংলার সব-কিছুই খারাপ। বাংলা ভাষা অতি নগণ্য ব'লে ভদ্র সমাজে তার ব্যবহারই তেমন রইল না, এমন কি স্বয়ং মধুসূদনও তাঁর প্রথম বয়সে এই ভাষাকে তাচ্ছিল্য ক'রে বর্জন করেছিলেন। সেই ভ্রান্ত আদর্শেরে যুগে দেশগতপ্রাণ বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন মাত্রই এই ভাষাকে যথোপযুক্ত সম্মান দিতে চেষ্টা করতেন। সেই অবস্থায় মধুসূদন প্রথম যখন তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' ও 'তিলোত্তমা' নামক অসাধারণ দুখানি কাব্যগ্রন্থ লিখলেন তখন দেশে এমন এক সাড়া প'ড়ে গেল, যার সঙ্গে তুলনা করা যায় এলিজাবেথীয় যুগের ইংলণ্ডে মার্লো কর্তৃক রচিত Tumburlaine নামক নাটকটি প্রকাশিত হওয়াতেও ঊনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সে হিউগো কর্তৃক রচিত 'Hernani' নামক নাটকটি প্রকাশিত হওয়াতে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তারই সঙ্গে। ভাষার ঐশ্বর্যে, ভাবের সৌন্দর্যে ও বর্ণনার চমৎকারিত্বে ওই দুটি কাব্য দেশের মানুষের কল্পনাকেও ছাপিয়ে গেল; বাংলায় অকস্মাৎ অমিত্রাক্ষর ছদের আবিষ্কার ক'রে তিনি বাংলা কাব্যকে পূর্বেকার পয়ারাদি ছন্দের বাঁধা নিগড় হতে মুক্তিদান করলেন; বাংলা ভাষাতে তিনি সুষ্ঠু রকমের বাক্যবিন্যাস ও ভাববিন্যাসের এমন এক সুন্দর পন্থা দেখিয়ে দিলেন, আর তাতে এমন উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় ও সুষমাময় সঙ্গীতের সৃষ্টি হতে থাকল যে সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতগণের আড়ষ্ঠ আভিজাত্য তার কাছে ম্লান হয়ে যেতে বসল। তাঁর কাব্যে প্রথম বেজে উঠল এমন এক অভূতপূর্ব সৌন্দর্য-স্বৈরিতার ধ্বনি যা আমাদের বর্তমান সাহিত্যে এখনও

প্রভাব বিস্তার ক'রে চলেছে। সংস্কৃত ভাষার যে বিশেষ রকমের ক্ষমতা আছে তা এই বাংলা ভাষার মধ্যেও সম্ভব হতে থাকল, – তা এই যে এর মাধ্যমে অনেক কিছুই গ'ড়ে তোলা যেতে পারে, তেমন মৌলিক প্রতিভার হাতে পড়লে এর ভিতর দিয়ে অনেক আশ্চর্য রত্নভাণ্ডার খুলে যেতে পারে; মধুসূদনের হাতেও তাই হতে দেখা গেল। তাঁর হাতে শ্রুতিমধুর ও ঝঙ্কারময় কাব্যের এমন উৎসধারা প্রবাহিত হতে থাকল যা প্রত্যেকের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে বাঙালী জাতিকে আগের চেয়ে অনেক বেশী বীর্যসম্পন্ন ও উন্নতমনা ক'রে তুলল। অবশ্য তাঁর রচনাগুলিকে যথেষ্ট বিরোধেরও সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এক দিকে যদিও তা প্রগতিকামী ব্যক্তিদের কাছে আদর পাচ্ছিল, অন্যদিকে তেমনি প্রাচীনপন্থী বিদ্যাভিমানীদের কাছে রীতিমত – অভিশপ্ত হতে থাকল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা ও গোড়া মতের লোকেরা তো বটেই, এমন কি স্বয়ং বিদ্যাসাগর পর্যন্ত এই কাব্যগুলি প্রথম প'ড়ে বিস্ময়ে শিউরে উঠেছিলেন। 'তিলোত্তমা' কাব্যে দেখা গেল যে, একালের নতুন আবেগময় সাহিত্য যেন সেকালের গুরুগম্ভীর অভিজাত সাহিত্যের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে; বলা বাহুল্য নতুন সাহিত্যেরই জয় হ'ল; এর স্বপক্ষে ছিল যৌবনের উদ্দীপনা, ছিল নবীন তেজ, আর ছিল এক অতুলনীয় প্রতিভা। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 'যুদ্ধং দেহি' ব'লে প্রথমে নামল 'তিলোত্তমা'; পরে 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যটি প্রকাশ হয়ে একেবারে 'ওস্তাদের মার' দিয়ে দিলে। স্বয়ং বিদ্যাসাগর যখন 'মেঘনাদবধ' সম্বন্ধে রায় দিলেন যে, এ এক চূড়ান্ত কাব্য, তখন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের দল একেবারে চুপ ক'রে গেল। মধুসূদনের বেলায় যে সকল কুচক্রী পণ্ডিতের দল তার স্বরে নিন্দা রটনা করেছিল, বঙ্কিমের লেখার বেলায় তারা একটু আধটু ক্ষীণ প্রতিবাদ জানানো ছাড়া আর কিছুই করতে সাহস করলো না; দেশের লোকের মন তখন আর তাদের কথা গ্রাহ্য করে না। কিন্তু তবু সেই নতুন বিজেতার গুণগ্রাহী হতে পেরেছিল কেবল অল্পসংখ্যক ব্যক্তি, অর্থাৎ যাঁদের কিছু কিছু মৌলিকত্ব আছে, যাঁরা সত্যিকার শিক্ষিত নরনারী, আর যাঁরা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত জমিদার বা ধনী ব্যক্তি, রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতো লোক, শিক্ষাদীক্ষা ও মনের প্রসারতার দিক দিয়ে যাঁরা সাধারণের উপরে, তেমন মানুষ তখনকার দিনে বাংলা দেশে কম ছিল না, কিন্তু এখন আর প্রায় দেখাই যায় না। যাই হোক, অত বড় একজন মহাকবি যখন মারা গেলেন তখন তাঁর ভক্তের সংখ্যা খুবই কম, খ্যাতিটাও সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

নবগঠিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন ওইরূপ সংগ্রামের পরে যে শান্তির অবস্থা এনে দিয়ে গেলেন, বঙ্কিম তখন সেই ক্ষেত্রে সেই কাজে এসে অবতীর্ণ হলেন। বস্তুতঃ নতুন বাংলা ভাষার এই দুই সৃষ্টিকর্তার মধ্যে আশ্চর্য একটা প্রভেদ রয়েছে, কর্মটা যদিও দুজনের একই জাতীয় কিন্তু কর্মফলের ভাগ্য পরস্পরের একেবারে বিভিন্ন। দুজনেরই বিদ্যাশিক্ষা হয়েছিল যথেষ্ট, প্রতিভাও ছিল মৌলিক ধরণের, শিল্পসৃষ্টির শক্তিটাও ছিল অসীম, সৌন্দর্যবোধ ও রসবিকাশের দক্ষতা ছিল প্রচুর; এই সকল দুর্লভ গুণের অধিকারী হয়ে প্রথমে দুজনেই ভুল পথে পা দিয়েছিলেন। কিন্তু এই পর্যন্তই দুজনের মধ্যে মিল দেখা যায়, তার পরে আর মিল নেই। একজন হলেন গদ্যসাহিত্যের সম্রাট, একজন হলেন কাব্যসাহিত্যের; দুজনের জীবনচরিতেও

বিস্তর প্রভেদ। মধুসূদন হলেন ধ্বনিসম্পদে ও ভাব-সম্পদে উচ্ছ্বসিত, হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে ফেনায়িত, চরিত্রে উচ্ছৃঙ্খল, অপব্যয়ী, অমিতাচারী, অসংযমী, আর শোকে দুঃখে নানা দুর্ভোগে ভুগে তাঁর জীবনদীপ অকালে নির্বাপিত হল। যিনি একজন অসুরের মতে মানুষ ছিলেন, তাঁর ঝটিকাবহুল জীবনের বিবরণগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন শেক্‌স্‌পীয়রের রাজা লিয়রের জীবননাট্যের বজ্রবাত্যাবিক্ষুব্ধ মর্মান্তিক দৃশ্যের পুনরভিনয় শুনছি, কিংবা থুকিডিয়াস বা গিবনের রচিত ইতিহাসের সেই করুণ কাহিনী পড়ছি যাতে প্রাচীন কালের এক এক দুর্ধর্ষ জাতির বা প্রবল পরাক্রান্ত রাজার মারাত্মক পতনের হৃদয়ভেদী বর্ণনা বিশদভাবে চিত্রিত হয়েছে। হৃদয় যার আছে সে রীতিমত বিচলিত না হয়ে মধুসূদনের এই জীবনকাহিনী পড়তে পারে না। এক হিসাবে তাঁকে শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ বলতে হয়, কিন্তু শুধু বাংলা দেশ ও পাঞ্জাব ছাড়া তাঁর লেখা আর কোন দেশেই পড়া হয় না; এমন কি তাঁরই মাতৃভূমির অন্তর্গত বোম্বাই বা মাদ্রাজ প্রদেশে কেউ তাঁর নাম পর্যন্ত শোনে নি। বঙ্কিমের জীবনের ইতিহাস কিন্তু এর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চরিত্রের মধ্যে যথেষ্ট দৃঢ়তা থাকলেও প্রকৃতিতে তিনি বরাবরই ছিলেন নম্র, সংযত, শান্ত; আর ভোগপ্রিয় ও আমোদপ্রিয় হ'লেও কোনোদিন অমিতাচারী ছিলেন না। ভাগ্যদেবীর বরপুত্র হওয়াতে কোনোদিন তাঁকে বিশেষ বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় নি। গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাসের আদর্শানুযায়ী যে পরিতোষ ও সুপক্ক পরিণতি জীবনে দেবতাদেরও কাম্য এবং যা থেকে তাঁরা সুপথগামী মানুষদেরও কখনো বঞ্চিত করেন না, তার সব-কিছুই তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল। একটা স্থির প্রশান্ত ও পরিপক্ক পরিণতিতে গিয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন। যদিও শেষ জীবনে তাঁকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে, কিন্তু মৃত্যুর আগে তাঁর মহৎ প্রচেষ্টার সাফল্য তিনি দেখে গেছেন। কল্পলোকের মাধুর্য বিতরণ ক'রে, চিন্তারাজ্যে জাগরণ এনে দিয়ে, আর দেশবাসীকে তাদের দেশমাতার মহিমাময়ী মূর্তি দেখিয়ে হৃদয়ে তাদের প্রেম ও আবেগের বন্যা বইয়ে দিয়ে যে জাতিকে তিনি প্রকৃত এক জাতি হিসাবে গ'ড়ে তোলবার জন্যে জীবনপণ করেছিলেন, সে জাতি তাঁর মৃত্যুকালে প্রচুর শোকাশ্রুপাত করেছিল।

বঙ্কিমের প্রভাব দেশের চারিদিকে ছেয়ে আছে, এখনও সে প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। তার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, একজন মারাঠি কিংবা গুজরাটি যদি একটা প্রয়োজনীয় কথা বলতে চায় তা হ'লে সাধারণতঃ সে তা ইংরেজীতেই বলে, কিন্তু বাঙালী বলে বাংলা ভাষায়। এ ব্যাপারের মধ্যে গভীর তাৎপর্য রয়েছে। কেবল সাহিত্যসৃষ্টি ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে ইংরেজী ভাষার প্রচলনই সর্বত্র ছিল, কিন্তু এখন কেবল রাজনীতির সম্পর্কে কিছু বলা ও সংবাদপত্রে লেখা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্র থেকে ইংরেজী ভাষাকে ক্রমশ বাতিল ক'রে দেওয়া হচ্ছে। অতঃপর একদিন আমাদের কথোপকথনের ভিতর থেকে ইংরেজীকে একেবারে ছেঁটে দেওয়া হবে। শুনতে পাই যে, কালীপ্রসন্ন ঘোষ এই নিয়ে উঠে প'ড়ে লেগেছেন। যাই হোক, আমাদের এই গদ্যসাহিত্যের স্রষ্টা সেই পথই সুগম ক'রে দিয়েছেন। মাত্র কিছুকাল আগেও কালীপ্রসন্নবাবুর মতো মন নিয়ে কেউ ওরূপ চেষ্টা করতেই যেতেন না, ইংরেজী ভাষা ছেড়ে

বাংলা ভাষায় কিছু তিনিও একটা অগৌরব ব'লে মনে করতেন। কিন্তু এখন তাঁর এই কাজ দেখে বোঝা যায় যে, আমাদের দেশের সাহিত্যরসিক ব্যক্তিরা নতুন বিপ্লবের পথ খোলা পেয়ে এখন সেই পথেই চলতে শুরু করেছেন, আর বাঙালীরা এমন এক উন্নতির অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যাতে এর থেকেই জগতের এক বিশিষ্ট জাতি ব'লে পরিগণিত হতে পারবে।

বঙ্কিমচন্দ্র

যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে,
সুপ্তিশয্যাপার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভিছে বারে বারে।
কালের নির্মম বেগে স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি;
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি'।
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা
ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে জীর্ণ শস্যকণা
অঙ্কুর ওঠেনা যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান
আরম্ভেই যার অবসান।

সে প্রার্থনা পুরায়েছ, হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নির্জীব স্থাবর।
নবযুগ সাহিত্যের উৎসে উঠি' মন্ত্রস্পর্শে তব
চিরচলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।
তাই শুনিতেছি আজি সে বাণীর তরঙ্গকল্লোলে,
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।
বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গণি,
তাই তব করি জয়ধ্বনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ১০ আগস্ট, ১৩৪৫-এ বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদ একটি সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্কিমচন্দ্র' কবিতাটি পাঠ করেছিলেন। পরে 'শনিবারের চিঠি'-তে মুদ্রিত হয়।

সাম্প্রত

বঙ্কিমচন্দ্রের পড়াশোনার জগৎ

অলোক রায়

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী *ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র* (১৯৬১) খুব নির্ভরযোগ্য বই নয়, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবনের যে-বিবরণ সেখানে পাই, তা নানাসূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের দ্বারা সমর্থিত। – "বঙ্কিম ক্লাশের পড়া অপেক্ষা অনেক বেশী বই পড়িতেন। হুগলী কলেজের লাইব্রেরীটি খুব বড় এবং এখানে বরাবর অনেক বই আছে। বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরী হইতে সাহিত্য, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, জীবনচরিত্র প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় পুস্তক পড়িয়া ফেলেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাই বলিতেছিলাম যে, বঙ্কিমের বিদ্যা কেবল পরীক্ষায় কৃতকার্যতার উপর নির্ভর করিত না।" বঙ্কিমচন্দ্র বলতে ভালোবাসতেন, স্কুল-কলেজে শিক্ষকের কাছে কিছু শেখেননি, ক্লাসের পড়াশোনা কখনও ভালো লাগত না – বড়ো অসহ্য বোধ হত। বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত জীবনীতে বলা হয়েছে, "হুগলী কলেজে পড়িবার সময় কিন্তু ইনি বড়ই অমনোযোগী ছিলেন। পড়ার সময়েও হয়তো স্কুলের পুস্তকালয়ে গিয়া আলমারীর কোণে বসিয়া নানারকম পুস্তক পড়িতেছেন দেখা যাইত। কিন্তু পড়ার কথা জিজ্ঞাসিলেও কেহ ঠকাইতে পারিতেন না।" (*সখা*, জানুয়ারি ১৮১৪)। মেদিনীপুর স্কুলে পড়ার সময় (১৮৪৪-৪৮) হেডমাস্টার এফ.টিও বালকের অসাধারণ মেধাশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে 'ডবল প্রমোশন' দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন (বছরে দু'বার উপরের ক্লাসে তুলে দেওয়া হয়)। শৈশবে সাহেব-হেডমাস্টারের (প্রথমে Tydd, পরে Sinclair) নির্দেশনা ও সাহচর্য ইংরেজি ভাষাশিক্ষার সহায়ক হয়। মেদিনীপুর থেকে কাঁটালপাড়ায় ফিরে হুগলি কলেজে ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৬ বঙ্কিমচন্দ্র পড়েন। তখন স্কুলে ইংরেজি গদ্য-পদ্য সংকলন, লেনির গ্রামার, ইংল্যান্ডের ইতিহাস, স্টুয়ার্টের

ভূগোল, অঙ্ক ও বাংলা পড়ানো হত। জুনিয়ার বিভাগে এক বছর পড়ার পর সিনিয়ার বিভাগে উন্নীত হন। কলেজে তখন প্রথম শ্রেণীতে সাহিত্য ও ইতিহাস পড়াতেন জে. গ্রেভ্‌স্ এবং গণিত ও ভূগোল ডাবলিউ ব্রেন্যাল্ড। ব্রেন্যাল্ড বদলি হলে তাঁর জায়গায় এলেন ঈশান বন্দ্যোপাধ্যায়। সেকালে ঈশানচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র – দুই ভাই ইংরেজিনবিশ হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। ঈশানচন্দ্র ইংরেজিতে লেখালিখির জন্য সম্ভবত বেশি পরিচিতি লাভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কলেজ জীবনের স্মৃতিচারণের সময় একমাত্র ঈশানচন্দ্রের নাম করেছেন – ''হুগলী কলেজে একটু আধটু শিখেছিলাম ঈশানবাবুর কাছে।'' সরকারি নথিপত্রে দেখা যায় জুনিয়ার স্কলারশিপ এবং সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। জুনিয়ার ও সিনিয়ার পরীক্ষায় বই নিতান্ত কম পড়তে হত না – ইংরেজিতে গোল্ডস্মিথ ও অ্যাডিসনের গদ্য, পোপ, প্রায়র ও অ্যাকেনসাইডের পদ্য, ইংল্যান্ডের সম্পূর্ণ ইতিহাস, গণিতের মধ্যে ইউক্লিড, অ্যালজেব্রা, ট্রিগনোমেট্রি ও অঙ্ক, দর্শনে অ্যাবারক্রম্বির মরাল ফীলিংস, এছাড়া ভূগোল, মানচিত্র অঙ্কন থেকে ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি, সার্ভেইং ও প্ল্যান ড্রইং, আর বাংলা তখনও পর্যন্ত যা বই বেরিয়েছে। যেমন *বেতাল পঞ্চবিংশতি*, *বিদ্যাকল্পদ্রুম* বা *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* (১০৫-১১৬ সংখ্যা)। সেকালে স্কুল-কলেজে ইংরেজিচর্চার উপর বেশি জোর দেওয়া হত, সে কথা বলাই বাহুল্য। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে ছাত্রদের যেমন পরিচয় ঘটত, তেমনি ইতিহাস-ভূগোল-গণিত-দর্শন সবই ইংরেজিতে ছাত্রদের পড়তে হত। তবে সেইসঙ্গে, অন্তত হুগলি কলেজে, বাংলা পড়ানোর উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস হুগলি কলেজে বাংলার শিক্ষকদের কথা বিশেষভাবে বলেছেন, কারণ এঁদের হাতেই ''সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা-সাহিত্যে হাতেখড়ি'' হয়েছিল (দ্র. *বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়*, সাহিত্য-সাধক-চরিত্রমালা, ১৯৪২)। জুনিয়ার বিভাগে বঙ্কিমচন্দ্র পড়েছিলেন কাশীনাথ তর্কভূষণের কাছে (পাঠ্যবই ছিল বঙ্গেতিহাস ও জ্ঞানার্ণব)। সিনিয়র ডিভিসনে অভয়াচরণ তর্কপঞ্চাননের কাছে অল্প কয়েকমাস পড়েছেন, বেশি সময় পড়েছেন *সুখবোধ* ব্যাকরণ-রচয়িতা ভগবচ্চন্দ্র রায় বিশারদের কাছে, তারপর গোবিন্দচরণ শিরোমণির কাছে। কলেজে পড়বার সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় গদ্য ও পদ্য লিখতে শুরু করেন। অনেকে তাঁর এইসব রচনায় ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব দেখেছেন – ''পয়ারে বা ত্রিপদীতে ঈশ্বরগুপ্তের ব্যর্থ অনুকরণ, রচনা স্থানে স্থানে অস্পষ্ট এবং স্থানে স্থানে স্পষ্টতঃ অশ্লীলতা দোষদুষ্ট। যে প্রতিভা এক দিন সমগ্র বাংলা দেশকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়াছিল, তাহার কোনও আভাস এগুলিতে পাওয়া যায় না। তবে একজন চতুর্দশ বা পঞ্চদশবর্ষীয় বালকের পক্ষে এই ধরণের রচনা যে বিস্ময়কর, তাহাতেও সন্দেহ নাই; আর কিছু না থাকুক, এগুলিতে অকালপক্কতার নিদর্শন আছে।'' (পূর্বোদ্ধৃত *বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়*) তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সময়ের গদ্য রচনা শুধু একালে 'অপাঠ্য' বিবেচিত হয় তাই নয়, ঈশ্বর গুপ্তেরও মনে হয়েছিল 'অভিধানের উপর অধিক নির্ভর' করার জন্য 'বঙ্কিমভাষা' পরিহার করলেই ভালো হয়। চোদ্দ বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র যখন লেখেন, ''গগণমণ্ডলে বিরাজিতা

কাদম্বিনী উপরে কম্মায়মানা শম্পা নক্কাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহরহঃ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে" (*সংবাদ প্রভাকর*, ২৩ এপ্রিল ১৮৫২) তখন তার মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব নয়, তার মধ্যে শিরোমণি-তর্কভূষণ-রায় বিশারদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় পরে এক সময়ে 'সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা'র ফলে বাংলাভাষা কীভাবে 'অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল' হয়ে পড়ে বঙ্কিম তা দেখিয়েছেন (দ্র. 'বাঙ্গালা ভাষা', ১৮৭৮)।

স্কুলে বা কলেজে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত পড়েননি (তাঁর ছাত্রাবস্থায় হুগলি কলেজে সংস্কৃত পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল না)। তবে ছেলেবেলা থেকে সংস্কৃত শ্লোক মুখস্ত করার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। ছোটোভাই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে তাঁদের জ্যেষ্ঠাগ্রজের বৈঠকখানায় অথবা পিতৃদেবের কাছ দেশবিখ্যাত পন্ডিত হলধর চূড়ামণি আসতেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃত আবৃত্তি ও শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হন, এবং তিনি চেয়েছিলেন যাদবচন্দ্রের তৃতীয় পুত্রটি যেন যথারীতি সংস্কৃত শিক্ষা করেন। কিন্তু তখন পিতাপুত্র উভয়ে ইংরেজিশিক্ষার উপর জোর দেন। তবে কলেজ থেকে বেরিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বেশ কিছুদিন ভাটপাড়ার রামশিরোমণির কাছে বিধিবদ্ধভাবে সংস্কৃত পড়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো নির্ভরযোগ্য জীবনী নেই, তাঁর সম্বন্ধে নানা ধরণের জনশ্রুতি গড়ে উঠেছে। যেটুকু তথ্য মেলে, তা হল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিয়েছেন, রামশিরোমণির কাছে বঙ্কিমচন্দ্র রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা পড়েছিলেন। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *বঙ্কিম-জীবনী*-তে বলা হয়েছে, হুগলি কলেজে পড়বার সময়েই (১৮৫৩-৫৬) বঙ্কিমচন্দ্র পুঁথি বগলে প্রায় প্রতিদিন 'শ্রীরামন্যায়বাগীশে'র কাছে পড়তে যেতেন। "১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য, কাব্য পড়িয়াছিলেন। চারি বৎসরে দশ বৎসরের পাঠ শেষ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি।" এছাড়া মাতামহ ভবাণীচরণ বিদ্যাভূষণের চতুষ্পাঠী ছিল, তাঁর বিশাল পুঁথি ও গ্রন্থসংগ্রহ মাতুলেরা পরে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেন, সম্ভবত মনে করা হয়েছিল, সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও চর্চার তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি। পূর্ণচন্দ্রের মনে হয়েছে, "ইহার মধ্যে কোন শাস্ত্র না ছিল! এমনকি জ্যোতিষ ও তন্ত্রের পুঁথিও ছিল। যেজন্য তিনি ফলিত-জ্যোতিষ শিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলি পড়িয়াই বঙ্কিমবাবুর সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য জন্মে। নতুবা শ্রীরামন্যায়বাগীশের টোলে মাঘ, ভারবি, নৈষধ প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্য পড়িয়া তাঁহার সংস্কৃত-বিদ্যার খতম হইত। এই সময় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী গ্রন্থের পঠন ত্যাগ করিয়া কেবল সংস্কৃত গ্রন্থের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।" 'এই সময়' ঠিক কোন্ সময় তা অবশ্য বোঝা যায় না।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাস লেখার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'সেক্ষপীয়র' বড়ো বেশি পড়তেন এমন কথা জানিয়েছেন, যদিও উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই নবকুমারের মুখে "দূরাদশ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিলীলা ..." শ্লোকের আবৃত্তি শুনেছি, পরে বিভিন্ন পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ হিসেবে রঘুবংশ, শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, রত্নাবলী ও উদ্ধবদূতের শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। কাপালিক কথোপকথনে সংস্কৃত ব্যবহার করেছে। *মৃণালিনী* উপন্যাসে। শুধু

মাধবাচার্য আছেন তাই নয়, পশুপতি আছেন যিনি সংস্কৃতে কথাবার্তা বলেন, এমনকি যবন মহম্মদ আলিও, "সংস্কৃতে উত্তর দিলেন, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃতের তিন ভাগ ফারসী, আর অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ যেরূপ সংস্কৃত, তাহা ভারতবর্ষে কখন ব্যবহৃত হয় নাই।"

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে দেবেন্দ্রের দেবীস্তুতি কৌতুকসৃষ্টির প্রয়োজনে পরিকল্পিত হলেও নব্যবাবুদের সংস্কৃতভাষা ব্যবহারের নিদর্শন; উন্মাদ অবস্থায় দেবেন্দ্রের 'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারং' গান শুধু গীতগোবিন্দের সঙ্গে তার পরিচয়ের প্রমাণ মাত্র। ১৮৭২ সালে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তখন কতটা সংস্কৃত জানতেন তা নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন। বিশেষত 'উত্তররামচরিত'-এর সৌন্দর্যবিচারে তিনি যখন বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হন ("ভবভূতির ভাষা অতিচমৎকারিণী। তাঁহার রচনা সমাসবহুলতা ও দুর্বোধ্যতা দোষে কলঙ্কিতা বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক" নিন্দিত হয়েছে), তখন বোঝা যায় ভালো-মন্দ সংস্কৃত বোঝার মতো ক্ষমতা তাঁর হয়েছে। তা না হলে সে সময়ে তিনি কালিদাস, ভবভূতি, মহাভারত বা সাংখ্যদর্শন নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন না এ কথা বলাই বাহুল্য। ১৮৭৩ সালে যখন তিনি *Mookerjee's Magazine*-এ 'The Study of Hindu Philosophy' লিখছেন, তখন নিজেকে তিনি বলছেন 'an indifferent Sanskrit scholar' (শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি)। কিন্তু কয়েকবছরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃতচর্চা বিস্তার ও গভীরতা লাভ করে। *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৫)-এর পাণ্ডিত্য তাঁর না থাকতে পারে, তবে সংস্কৃত পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলংকার, ব্যাকরণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। চন্দ্রশেখরের মতো বঙ্কিমচন্দ্রেরও বহুযত্ন-সংগৃহীত পুঁথি ও গ্রন্থসংগ্রহ ছিল বিশাল – মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন; কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম, আর এগুলি যে শুধু গৃহের শোভাবর্ধন করেনি, অধীত ও আলোচিত হয়েছে তার প্রমাণ মেলে বঙ্কিমরচনাবলীতে। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র যে মোটামুটি হিন্দুর ষড়্দর্শনের প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত ছিলেন – সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।" (বঙ্কিম-মনীষা, ১৯৮৭) পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, পুরাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ছাত্রের মতো গভীর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছেন। কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব (অনুশীলন), শ্রীমদ্ভগবদগীতার টীকা, এবং 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম' বিষয়ক প্রবন্ধ, 'The Study of Hindu Philosophy', 'Letters on Hinduism' এবং 'Vedic Literature' পড়লে বোঝা যায় সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কত গভীর পরিচয় ছিল। মাতামহের সংগ্রহ তো ছিলই, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও দেশে ও বিদেশে মুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করেছিলেন, ১৮৬৩ সালে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার প্রয়োজনেই তিনি কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। মনে হয় এই সময় থেকে 'ওরিয়েন্টালিস্ট'দের রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

উনিশ শতকে ভারতবিদ্যাচর্চায় ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যখন আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতিপদ্ধতির সাহায্যে ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু করেন, যখন একদিকে যেমন অনেক অজানা তথ্য উদঘাটিত হয়, দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সম্পাদনা ও অনুবাদের সাহায্যে সুলভ হয়, তেমনি অন্যদিকে ভাষা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা, আন্তরিকতা এবং কদাচিৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রবণতা তাঁদের রচনাকে স্বনির্ভরযোগ্য ও আপত্তিকর করে তোলে। বঙ্কিম রচনাবলী পড়লে দেখা যায়, সে সময় পর্যন্ত প্রকাশিত ইউরোপীয় ওরিয়েন্টালিস্টদের যাবতীয় রচনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ভালো পরিচয় ছিল। *লোকরহস্য* ও *কমলাকান্ত*-এর একাধিক রচনায় এঁদের সম্বন্ধে শ্লেষোক্তি লক্ষ করা যায়, যেমন – "পাঠক মহাশয় বৃহল্লাঙ্গুলের ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বিস্তিত হইবেন না। এইরূপ তর্কে মোক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা লিখিতে জানিতেন না। এইরূপ তর্কে কেমন মিল স্থির করিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অসভ্য জাতি এবং সংস্কৃত ভাষা অসভ্য ভাষা।" (ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল)"। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে ইহাদিগের প্রধান পুস্তক তৎপ্রণীত ভগবদ্গীতা বাইবেল হইতে অনুবাদিত। সুতরাং বাইবেলের পূর্বে যে ইহাদিগের কোন ভাষা ছিল না, ইহা একপ্রকার স্থির। পাদটীকায় বঙ্কিমের মন্তব্য "সাবধান কেহ হাসিবেন না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডুগাল্‌ড্ স্টুয়ার্ট যথার্থই এই মতাবলম্বী ছিলেন।" (কোন স্পেশিয়ালের পত্র)। রূপক পরিহার করে বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে গভীর গম্ভীর তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন সেখানেও বারবার ইউরোপীয় পণ্ডিতদের রচনা সম্বন্ধে তাঁর উত্তেজনা প্রকাশ পেয়েছে। (বোঝা যায় তাঁদের রচনা তিনি মন দিয়ে পড়েছেন, কখনও তাঁদের রচনার উপর একান্ত নির্ভর করেছেন। যেমন জন মুরের *Sanskrit Texts*, এবং উইলিয়াম হেস্টির সঙ্গে বিতর্কের সময়ে স্বীকার করেছেন, "No one questions their *scholarship*. I can assure him that men like Max Müller and Goldstüker, Colebrooke and Muir, Weber and Roth do not stand in need of a champion like Mr. Hestie. I yield to none in my profound respect for their learning, their ability and the large-hearted philanthropy which leads them to devote themselves to pursuits from which my countrymen often recoil in fear and despair. And I, as a native of India, would be certainly shamefully wanting in gratitude, if I do not acknowledge their great services in the dissemination of the Sanskrit language and Sanskrit learning throughout the civilised world." (16.10.1882)। বিশেষভাবে *কৃষ্ণচরিত্র* লেখার সময় ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতামত বা প্রদত্ত তথ্য মানতে না পেরে তিনি এই ধরনের মন্তব্য করেন,

> আর দিকে গুরুতর বিপদ, বিলাতি পাণ্ডিত্য। ইউরোপ ও আমেরিকার কতকগুলি পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ভূত করিতে নিযুক্ত, কিন্তু তাঁহাদের একথা অসহ্য যে, পরাধীন দুর্ব্বল হিন্দুজাতি কোন কালে সভ্য ছিল এবং সেই সভ্যতা অতি প্রাচীন। অতএব দুই চারি জন ভিন্ন তাঁহারা সচারচর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্ব্ব করিতে নিযুক্ত। তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক

ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থ সকলে যাহা কিছু আছে – হিন্দু ধর্ম্ম বিরোধী বৌদ্ধগ্রন্থ ছাড়া – সকলই আধুনিক আর হিন্দুগ্রন্থে যাহাই আছে, তাহা হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, নয় অন্য দেশ হইতে চুরি করা। কোন মহাত্মা বলেন, রামায়ণ হোমারের কাব্যের অনুকরণ কেহ বা বলেন ভগবদগীতা বাইবেলের ছায়ামাত্র। হিন্দুর জ্যোতিষ চীন, যবন বা কালডিয় হইতে প্রাপ্ত, হিন্দুর গণিতও পরের কাছে পাওয়া, লিখিত অক্ষরও কোন সীমীয় জাতীয় হইতে প্রাপ্ত। এ সকল কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের বিচার প্রণালীর মূল সূত্র এই যে, ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে পারতপক্ষে যাহা পাওয়া যায়, তাহা মিথ্যা বা প্রক্ষিপ্ত, যাহা ভারতবর্ষের বিপক্ষে পাওয়া যায়, তাহাই সত্য। পাণ্ডবদিগের ন্যায় বীরচরিত্র ভারতবর্ষীয় পুরুষের কথা মিথ্যা, পাণ্ডব কবিকল্পনা মাত্র, কিন্তু পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি সত্য, কেন না, তদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবাসীরা চূয়াড় জাতি ছিল, তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। ফর্গুসেন সাহেব অট্টালিকার ভগ্নাবশেষে কতকগুলো বিবস্ত্রা স্ত্রীমূর্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিত না, এ দিকে মথুরা প্রভৃতি স্থানের অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য দেখিয়া বিলাতী পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, এ শিল্প গ্রীক মিস্ত্রীর। বেবর (Weber) সাহেব, কোন মতে হিন্দুদিগের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাচীনতা উড়াইয়া দিতে না পারিয়া স্থির করিলেন, হিন্দুরা চান্দ্র নক্ষত্র মণ্ডল বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছে। বাবিলনীয়দিগের যে চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল আদৌ কখনও ছিল না।

উনিশ শতকে ভারতবিদ্যাচর্চা নিয়ে বিদেশী এবং স্বদেশী পণ্ডিতদের বিতর্ক আজকের দিনে অনেকটা গুরুত্ব হারিয়েছে। কিন্তু আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখালিখির মধ্যে থেকে জেনে নিতে পারি তাঁর বিশাল অধ্যয়নের জগতের কথা। ছাত্রজীবনে তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেছেন, মেধাবী ছাত্রের কাছে যা অপ্রত্যাশিত ছিল না, কিন্তু যখন তিনি সরকারী কর্মচারী হিসেবে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ব্যতিব্যস্ত (শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চিঠিতে 'over-worked' এবং 'hard-worked' অবস্থার কথা আছে, কর্মচারীর অভাব, রোড সেসের দায়িত্বভার ইত্যাদি সাময়িক সমস্যার কথা আছে) তখন লেখাপড়ার কাজ কঠিন হয়ে উঠেছে। অথচ লেখবার জন্য পড়তে হয় – 'সাংখ্যদর্শন' বা 'The Study of Hindu Philosophy' লেখার জন্য তাঁকে প্রচুর পড়তে হয়। "To make it worthy of your magazine I must go through a fearful amount of tought reading, which to an indifferent Sanskrit scholar and hard-worked man like myself would be dreadful." বঙ্কিমচন্দ্র সারাজীবন প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য-সমাজ-ইতিহাস-দর্শন, এমনকি বিজ্ঞান বিষয়ক বইপত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

২

ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় নিতান্ত বালক বয়সে। জুনিয়ার ও সিনিয়ার স্কলারশিপ,

পরে এন্ট্রান্স ও বি.এ. পরীক্ষা দেওয়ার সময়ে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। শেকসপিয়ার, ড্রাইডেন, পোপ, অ্যাডিসন, গোল্ডস্মিথ যেমন পড়েছেন, তেমনি রোমান্টিক কবিদের রচনাও পড়তে হয়েছে (রিচার্ডসনের সিলেকশনস সেকালে জনপ্রিয় ছিল)। *রজনী* উপন্যাসে অমরনাথের মধ্যে পরিণত বয়সের বঙ্কিমচন্দ্রকে হয়তো কিছুটা খুঁজে পাওয়া যায় – অমরনাথ কাম্য কি খুঁজে পায় না – "টিণ্ডল, হক্সলী, ডার্বিন এবং লায়ল এক আসনে বসিয়া যাবজ্জীবন ঐ ক্ষুদ্র নীহারবিন্দুর, ঐ বালুকাকণার বা ঐ শিয়ালকাঁটা ফুলটির গুণ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না – তবু আমার কাম্য বস্তু নাই? আমি কি?" ফলে অমরনাথ যখন শচীন্দ্রের টেবিলে 'সেক্ষপিয়র গেলেরি' বইটির পাতা ওলটাতে ওলটাতে চিত্রগুলির সমালোচনা আরম্ভ করলেন, তখন অবাক হই না। অমরনাথ স্রষ্টাকে আমাদের মনে পড়ে, তাঁর পক্ষে সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞান সব কিছু নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব, কারণ তাঁর পড়াশোনার জগৎ বহুবিস্তৃত – "সেক্ষপিয়রের নায়িকাগণ হইতে শকুন্তলা, সীতা, কাদম্বরী, বাসবদত্তা, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি আসিয়া পড়িল। অমরনাথ একে একে তাঁহাদিগের চরিত্রের বিশ্লেষণ করিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের কথায় ক্রমে প্রাচীন ইতিহাসের কথা আসিয়া পড়িল, তৎপ্রসঙ্গে তাসিতস, প্লুটার্ক, থুকিদিদিস প্রভৃতির অপূর্ব্ব সমালোচনার অবতারণা হইল। প্রাচীন ইতিবৃত্ত লেখকদিগের মত লইয়া অমরনাথ কোম্‌তের ত্রৈকালিক উন্নতিসম্বন্ধীয় মতের সমর্থন করিলেন। কোম্‌ৎ হইতে তাঁহার সমালোচক মিল ও হক্সলীর কথা আসিল। হক্সলী হইতে ওয়েন ও ডারউইন, ডারউইন হইতে বুকনেয়র সোপেনহয়র প্রভৃতির সমালোচনা আসিল। অমরনাথ অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যস্রোত আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।"

সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় বিষয় ছিল, তা নিয়ে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। গ্রীক ও রোমান সাহিত্য থেকে শুরু করে জর্মান, ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয় সাহিত্যের সঙ্গে অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর পরিচয় ছিল। উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙালি গ্রীক ও রোমক কাব্য, নাটক ও ইতিহাস গ্রন্থাদি পড়তেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় ইউরিপিদিস, সফোক্লিস, সেনেকা, হোমার, বর্জিল, ওবিদ, প্লতস, টেরেন্স, হরেস প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কমলাকান্ত যদিও বলেছে "আমরা উত্তম নবেল লিখিতে পারি, তবে কি না ইচ্ছা ছিল যে, বাজে নবেল না লিখিয়া ডনকুইকযোট বা জিলব্লার পরিশিষ্ট লিখিব। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইখানি পুস্তকের একখানিও পড়া হয় নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের যে বইগুলি পড়া ছিল তার প্রমাণ আছে। ফরাসি লেখকদের মধ্যে এমিলি জোলার রচনার সঙ্গে পরিচয় থাকলেও তা তাঁর পছন্দ হয়নি, তাঁর পছন্দের লেখক বিক্টর হ্যুগো। ফরাসি ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটু নিবিড় যোগ ছিল। তবে তিনি কতটা ফরাসি ভাষা জানতেন তা নিয়ে অনেকের সংশয় আছে। সৈয়দ মুজতবা আলী মনে করতেন বঙ্কিমচন্দ্র ফরাসি জানতেন না। কিন্তু 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' রচনায় সুস্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়েছে "যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।" গ্যেটে (ফাউস্ট), কান্ট, সোপেনহাওয়ার, ফিক্‌টে,

শ্লিয়ের মেকর, হেগেল প্রভৃতি জর্মান কবি ও ভাবুকদের রচনা থেকে উদ্ধৃতির সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি অনুবাদ ব্যবহার করেন, কারণ অদ্ব্যর্থ ভাষায় তিনি জানান "দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি নিজে জর্ম্মান জানি না।" (*ধর্ম্মতত্ত্ব*, ক্রোড়পত্র)। কিন্তু ১৮৭১ সালে 'Buddhism and the Sankhya Philosophy' প্রবন্ধে তিনি Barthelemy St. Hilaire এর *Le Bouddha et sa Religion* বইয়ের আলোচনা করেছেন। পরে *শ্রীমদ্ভগবদগীতা* প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ-ব্যাখ্যার সময়ে পাদটীকায় হিউথসাঙ-এর ফরাসি অনুবাদ (Stanislaus Julien) থেকে 'Le Champ du bonheur' বাক্যাংশটি উদ্ধৃত করেছেন, যা থেকে মনে হয় তিনি ফরাসি জানতেন। টেইন-এর ইতিহাসগ্রন্থ ও কোম্‌তের বিভিন্ন রচনার সঙ্গে তাঁর ভালোমতো পরিচয় ছিল। দেকার্তে ও পাসকাল পড়েছিলেন তবে দ্বারকানাথ মিত্র বা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মতো ফরাসী জানতেন না এ কথা স্বীকার্য (যে কারণে সম্ভবত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মনে হয়েছে, কোম্‌ত-বাদ বঙ্কিমচন্দ্র সেভাবে আয়ত্ত করতে পারেন নি। তিনি কনগ্রিভ অনূদিত *Catechism of Positive Religion* থেকে কোম্‌তের মত সংগ্রহ করেছেন)।

ইংরেজি ভাষাকে বিশ্বজ্ঞানের গবাক্ষ বললে ভুল হয় না। ইংরেজির মধ্য দিয়ে তিনি গ্রীক-লাতিন, ইতালীয় ও স্পেনীয় ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। হিন্দি ও উর্দু তিনি জানতেন কিন্তু কতটা গভীরভাবে শিক্ষা করেছিলেন জানি না। (ছেলেবেলায় পূর্বমেদিনীপুরে থাকার ফলে তিনি দাবি করতেন, ওড়িয়া তিনি মাতৃভাষার মতোই জানতেন)। পিতা যাদবচন্দ্রের মতো পুত্র ফারসি জানতেন না, জানলে হয়তো তাবাকৎ-ই-নাসিরি বা সয়ের মুতক্ষরীণ পড়বার জন্য ইংরেজি অনুবাদের সাহায্য নিতে হত না।

সাহিত্য ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ ও চর্চার বিষয় বিজ্ঞান এবং ইতিহাস। সেকালে কলেজে ছাত্রদের অল্পস্বল্প বিজ্ঞান পড়তে হত – শুধু বিশুদ্ধ গণিত নয় ফলিত গণিত, ত্রিকোণমিতি, জমি জরিপ এবং বিশেষভাবে ন্যাচারাল ফিলজফি অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞান। *ধর্ম্মতত্ত্ব* রচনার সময়েও বহির্বিজ্ঞান শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোম্‌তের মতানুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয় হল Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, Biology এবং Sociology। বহির্বিজ্ঞান ও অন্তর্বিজ্ঞান দুয়েরই দরকার, এবং সেই জ্ঞান "পাশ্চাত্যের নিকট যাচ্‌ঞা করিবে।" বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানরহস্য রচনা কোনো সাময়িক উত্তেজনা বা কৌতূহলের ফল নয় – তাঁর পরিকল্পিত জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সম্যক স্ফূর্তি ও পরিণতির জন্য অপরিহার্য। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধগুলি বঙ্কিমচন্দ্র যখন লেখেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যাতে "আলোচিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বালকেরা এবং আধুনিক শিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রী বুঝিতে পারেন।" (ভূমিকা, *বিজ্ঞানরহস্য*, ১৮৭৫)। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, "এই সকল প্রবন্ধ প্রধানতঃ হক্সলী, টিণ্ডল, প্রকটর, লাকিয়র, লায়েল প্রভৃতি লেখকের মতাবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে।" পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের কোনও আকাঙ্ক্ষা ছিল না, প্রবন্ধগুলির মধ্যে ভুলভ্রান্তি থাকা সম্ভব তাও তিনি জানতেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পড়াশোনার পরিধি এ থেকে কিছুটা বোঝা

যায়, আর বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব জানা এবং জানানোর ইচ্ছা এর মধ্যে প্রকাশ পায়। কালীনাথ দত্ত জানিয়েছেন, বারুইপুরে থাকার সময় ডাক্তার মহেশচন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে তাঁর অনুবীক্ষণ যন্ত্রটি এনে "বঙ্কিমবাবু প্রতিদিন অপরাহ্নে সেই অনুবীক্ষণ সহযোগে কীটাণু, নানা পুষ্করিণীর দূষিত জল, উদ্ভিদের সূক্ষভাগ এবং জীবশোণিত প্রভৃতি সূক্ষ পদার্থজাতির পরীক্ষা করিতেন।... পরীক্ষিত পদার্থনিচয়ের অপরূপ শোভা সৌন্দর্য সন্দর্শন করিয়া তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিতেন, জগতের মধ্যে কেবল আমরাই কুৎসিত, আর আর সমস্তই সুন্দর।" (*বঙ্কিম-প্রসঙ্গ*, পৃ.২১৭)

বঙ্কিমচন্দ্রের পড়াশোনার জগৎ সম্বন্ধে কালীনাথ দত্তের সাক্ষ্য মূল্যবান, "আমাদের বারুইপুরে অবস্থিতিকালে যখন শারীরিক অস্বাস্থ্যনিবন্ধক বঙ্কিমবাবু মধ্যে মধ্যে অধ্যয়নে অসমর্থ হইতেন, তখন আমাকে রাত্রিকালে ডাকিয়া পাঠাইতেন, কিংবা কোনও নির্দিষ্ট সময়ে আমাকে আসিতে বলিতেন। আমি পড়িতাম, তিনি শ্রবণ করিতেন, এবং স্থলবিশেষে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন। সন্ধ্যার পর ৭।।০ হইতে ১১।।০ পর্যন্ত তাঁহার পাঠের নিয়ম ছিল। আমি যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতাম, তাহা কখনই Light Reading ছিল না। তৎসমস্তই গভীরচিন্তাপূর্ণ সারগর্ভ পুস্তক। একখানি পুস্তকের বিষয় আমার স্মরণ আছে; তাহাতে 'Progressive Development of Species' বিষয়ে লেখা ছিল।" (তদেব, পৃ.২১৬) কর্মব্যস্ত প্রশাসক ও সাহিত্যিকের জীবন কাটিয়ে বিজ্ঞানচর্চার জন্য বেশি সময় হাতে ছিল না। ১৮৭২ সালে মহেন্দ্রলাল সরকার যখন 'ভারতীয় বিজ্ঞান সভার 'অনুষ্ঠান পত্র' প্রকাশ করেন, তখন *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় তিনি শুধু সেই প্রস্তাব সমর্থন করেননি, তিনি ভারতবাসীকে বিজ্ঞানচর্চার জন্য সোৎসাহে আহ্বান করেন, "বিজ্ঞান অবহেলা জন্য আমরা দিন ২ বিদেশীয় জাতিগণের আয়ত্তাধীন হইতেছি; বস্তুবিচারে অক্ষম হইয়া কদন্ন ভোজনে, অপেয় পানে, অপরিশুদ্ধ বায়ু সেবনে দিন ২ দুর্বল হইতেছি। চিকিৎসাশাস্ত্রে নিতান্ত অজ্ঞ হওয়ায় বৈদেশিক প্রথাগত চিকিৎসকগণের হস্তে পতিত হইয়া সর্ব্বদাই জ্বর জ্বালায় কাতর থাকিতে হয়। বিজ্ঞানের ক্রমেই লোপ সম্ভাবনা।... ভারতবাসীয়দিগকে বিজ্ঞানে যত্নশীল করিতে হইবে, ও তাঁহার যত্ন করিতেছেন কি না তাহা সর্ব্বদা দেখিতে হইবে।" (ভাদ্র ১২৭৯)। বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞানী ছিলেন না, কিন্তু বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজন বুঝতেন। এবং সময় সুযোগ পেলে বিজ্ঞানগ্রন্থ পাঠ করতেন।

৩

বঙ্কিমচন্দ্র সব ধরনের বই পড়তেন – সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান সব বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে আগ্রহ স্বাভাবিক। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে ফরাসি ও জর্মান সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ভালো পরিচয় ছিল। সংস্কৃতচর্চার উদ্দেশ্য গোড়ায় ছিল সাহিত্যপাঠ, পরে ধর্মদর্শনের গ্রন্থপাঠ। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র মোটামুটি হিন্দু ষড়দর্শনের প্রধান সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। (দ্র. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *বঙ্কিম-মনীষা*,

১৯৮৭) সাংখ্যদর্শন নিয়ে তিনি ইংরেজি ও বাংলায় প্রবন্ধ লিখেছেন। *কৃষ্ণচরিত্র* লেখার সময়ে মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণ ভালোভাবে পড়েছিলেন। ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে অ্যারিস্টটল-প্লেটো থেকে শুরু করে কান্ট, হেগেল, স্পিনোজা, মিল, বেন, হিউম, হার্বার্ট, লুথার সকলের রচনার সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ছিল। তবে সেকালে অনেকেই তাঁকে কোম্‌ৎপন্থী মনে করতেন। *ধর্ম্মতত্ত্ব-অনুশীলন*-এর মধ্যে জান রবার্ট সীলির *Eece Homo, Natural Religion* কথা আছে। তবে প্রথম জীবনে হেনরি টমাস বাক্‌ল-এর *History of Civilization in England* এবং লেকির *History of Rationalism of Europe* বই দুটি বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ-সাহিত্য-ভাবনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

মনে রাখতে হবে বই দুটি এক হিসেবে পাশ্চাত্য সভ্যতা তথা চিন্তালোকের ইতিহাস। আমরা জানি বালক বয়স থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস পড়তে ভালোবাসতেন। তবে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে তো তখন ছিল হুইলার, মার্শম্যান, লেথব্রিজ, এলফিনস্টোন, ওয়েস্টল্যান্ড, স্টুয়ার্ট আর হান্টারের বই। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছে "আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরোজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার 'প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদশাহ, বাঙ্গালার সুবাদার ইত্যাদি নিরর্থক উপাধিধারণ করিয়া, নিকদ্বেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগের জন্ম মৃত্যু গৃহবিবাদ এক খিচুড়ীভোজন মাত্র। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নয়। বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।" (বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, ১৮৮০) বাংলার ইতিহাস নিয়ে তাঁর আগ্রহের পিছনে জাতীয়তাবোধ কাজ রয়েছে – "অহঙ্কার অনেক স্থলে মনুষ্যের উপকারী; এখানেও তাই। জাতীয় গর্ব্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল।" (বাঙ্গলার ইতিহাস, ০০০)। এখানে বেশ বোঝা যায় সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম ধারা হিসেবে ইতিহাসকে দেখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্রকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, এবং তাঁর মনোজগতেরও অনেকটা সন্ধান রাখতেন। তিনি একাধিকবার জানিয়েছেন, "কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তাঁহার বেশী সখ ছিল। ইউরোপীয় ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই ফ্লরেন্সের মেডিচিদের কথা কহিতেন। 'রিনাইসেন্স' (Renaissance) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গালারও যাহাতে আবার নবজীবনসঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি বাঙ্গালার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান।" (বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়, *বঙ্কিম-প্রসঙ্গ*, পৃ. ১৫৭-৫৮)। "বঙ্কিমবাবু ইতিহাস ও নবেল পড়িতে বড়ো ভালবাসিতেন। তখন ভারতবর্ষের ইতিহাস ছিল না ও হয়ও নাই। বঙ্কিমবাবু ইউরোপের ইতিহাস খুব ভাল জানিতেন। ভারতবর্ষের মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারে যে-সকল ইতিহাস ছিল, তাহা সমস্তই তিনি পড়িয়াছিলেন।" (সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, ১৯১৩; *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*,

দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৮১, পৃ. ২৫২)।

ইউরোপে প্রাচীন কাল থেকে ইতিহাসের চর্চা চলেছে। হিরোদোতস ও থুসিদিদিসের যুদ্ধবিবরণ যত না তথ্যের জন্য, তার থেকে বেশি বর্ণনাভঙ্গির জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে। রোমক ঐতিহাসিক লিভির কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র জানেন "আধুনিক ইউরোপীয়েরা এই সকল ইতিহাসবেত্তাদিগকে (Livy, Herodotus প্রভৃতিকে) আদর করেন না। কিন্তু তাঁহারা এমন বলেন না যে, ইঁহাদের গ্রন্থ অনৈসর্গিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ, এই জন্যই ইহারা পরিত্যাজ্য। তাঁহারা বলেন যে, ইঁহারা যে সকল সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে সকল সময়ে ইহারা নিজেও বর্ত্তমান ছিলেন না, কোন সমসাময়িক লেখকেরও সাহায্য পান নাই; অতএব তাঁহাদের গ্রন্থের উপর, প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া নির্ভর করা যায় না।" কিন্তু তা সত্ত্বেও "আধুনিক সমালোচকের দল যাই বলুন, লিবি বা হেরোডোটসকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাস আজিও লিখিত হয় না।" (*কৃষ্ণচরিত্র*) প্রাচীনকালের ঘটনাবলীর বিবরণে কিছু অলীক অনৈসর্গিক ঘটনা থাকতেই পারে, সেজন্য Megasthesis বা Ktesias কে একেবারে পরিহার করা যাবে না। উনিশ শতকে অনেকদিন পর্যন্ত গিবনের *Decline and Fall of the Roman Empire* এবং হিউমের *History of England* আদর্শ ইতিহাসগ্রন্থ বলে পরিগণিত হত। তবে ক্রমশ ইতিহাসের ধারণা বদলেছে, মেকলে ও ফ্রুডের ইংল্যান্ডের ইতিহাস দুই ভিন্ন জাতের রচনা। ইতিহাসের সংজ্ঞা-স্বরূপ নিয়ে উনিশ শতকেই ইউরোপে বিতর্ক দেখা গেছে। ইতিহাসের মধ্যে কাব্যের সন্ধানও সম্ভবত খুব অভিনব ব্যাপার নয় – "ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইল ও ফ্রুডের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামর্তীন ও মিশালা-র গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থে আছে। মানব-চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেত্তাও মনুষ্যচরিত্র বর্ণন করেন; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য্যসাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাঁহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য্য আসিয়া উপস্থিত হইবে।" (*কৃষ্ণচরিত্র*)

দুর্গেশনন্দিনী থেকে শুরু করে *সীতারাম* পর্যন্ত একাধিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র আখ্যানের পটভূমি হিসেবে ইতিহাসকে ব্যবহার করেছেন। *রাজসিংহ* ছাড়া ইতিহাসের পটাশ্রিত অন্য উপন্যাসগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসও বলেননি। – "আমি পূর্ব্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।" আসলে *রাজসিংহ*-কেও যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না, কারণ বঙ্কিমচন্দ্র যে ইতিহাসগ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করেছেন সেগুলি কোনোটি নির্ভরযোগ্য নয়, যথা জেমস টডের *Annals and Antiquities of Rajasthan*, অর্মের *Historical Fragments of the Mogul Empire* এবং নিকোলো মানুচীর *Storia do Mogur* (বকক্র অনূদিত ও নির্মিত)। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও জানতেন তিনটি বইয়ের মধ্যে

পরস্পর বিরোধী অনেক ঘটনা ও বর্ণনা আছে। – ''ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার পক্ষে বিচার আবশ্যক। আমি যে বিচার বড় করি নাই।'' অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সময়ে প্রাপ্ত যাবতীয় তথাকথিত 'ইতিহাস' গ্রন্থ পড়েছেন, তার সঙ্গে ''উপন্যাসের ঔপন্যাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনাপ্রসূত অনেক বিষয়ই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।'' সেকালে বাংলার ইতিহাস বলতে বোঝাতো চার্লস স্টুয়ার্টের *History of Bengal*। আলেকজান্ডার ডাও সাহেবের ফিরিস্তার অনুবাদ নামে 'মেকী বাংলার ইতিহাস' অবলম্বনে সেকালে অনেকে 'ইতিহাস' লিখেছেন। *দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাসের অনৈতিহাসিকতার জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী ফিরিস্তার অনুবাদ নামে প্রচলিত বাংলার ইতিহাস। *মৃণালিনী* উপন্যাস লেখার সময়েও বঙ্কিমচন্দ্র নির্ভর করেছেন স্টুয়ার্টের বইয়ের উপর, আবার স্টুয়ার্টের অবলম্বন মিনহাজউদ্দিন-প্রণীত তাবাকৎ-ই-নসিবি। *চন্দ্রশেখর* লেখার সময়ে ''ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার কোন কোন কথা সচরাচর প্রচলিত ভারতবর্ষীয় বা বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সয়ের মতাক্ষরীন নামক পারস্য গ্রন্থের একখানি ইংরেজি অনুবাদ আছে; ঐতিহাসিক বিষয়ে কোথাও কোথাও ঐ গ্রন্থের অনুবর্তী হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ অতি দুর্লভ, ঐ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের যোগ্য।'' *আনন্দমঠ* নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস, তবে সন্ন্যাসীবিদ্রোহের ঐতিহাসিক বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্র নিয়েছিলেন গ্লেইগ-এর *Memoirs of the Life of Warren Hastings* বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হেস্টিংসের চিঠি থেকে। মহামন্বন্তরের বর্ণনা হান্টারের *Annals of Rural Bengal* থেকে। *দেবীচৌধুরাণী*র পটভূমি নেওয়া হয়েছে হান্টারের *A Statistical Account of Bengal* বই থেকে। যদুনাথ সরকার *দেবীচৌধুরাণী*র 'ঐতিহাসিক ভূমিকা'য় লিখেছেন, ''বঙ্কিম মহাপণ্ডিত ছিলেন, বহু বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার পড়াশোনা ছিল, এবং গভীর চিন্তার সাহায্যে তিনি পঠিত জ্ঞানকে পরিপাক করিয়াছিলেন।'' বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসগুলির শিল্পসার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে তাঁর ইতিহাসচর্চা নিয়ে সংশয় নেই। আর শুধু ইতিহাস নয়, সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান- সর্বশাস্ত্রে বহুপাঠী বঙ্কিমচন্দ্র পড়াশোনার ব্যাপারে কখনও ক্লান্তিবোধ করেননি, জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি 'a fearful amount of tough reading' থেকে তিনি বিরত হন নি। হয়তো এখানেই নিহিত আছে তাঁর যথার্থ 'humanist' পরিচয়।

সাহিত্য ও ধর্মের পটভূমিকায় বঙ্কিমমানস

সন্তোষকুমার দত্ত

(সূচনা)

সংসারে একটি শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন কান্নাই তার অস্তিত্বের অভিজ্ঞান। পৃথিবীতে সকলের মত তারও চাহিদা বা দাবিপূরণের উৎস – কান্না। সংসার ও সমাজ সেই দাবি পূরণের জন্য একদিকে যেমন দায়বদ্ধ, অপরদিকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছেও সংসার ও সমাজের দাবি স্বাভাবিক।

ইংরেজি ১৮৩৮-এর ২৬ জুন রাত ৯ টায় নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় কান্না দিয়ে যে শিশুটির আত্মঘোষণা, তরুণ বয়স থেকেই একটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের জন্য সে ব্যাকুল ঃ 'এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?' বলা বাহুল্য, ইনি বঙ্কিমচন্দ্র। জীবনের লক্ষ্য কি – তারই উত্তর-সন্ধানী তিনি। অনেক প্রকার লোক প্রচলিত উত্তর পেয়েও সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য তাঁর অনেক কষ্ট স্বীকার, লিখন-পঠন, বহু মানুষের সঙ্গলাভ। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান এবং দেশী-বিদেশী শাস্ত্র অধ্যয়ন। শেষ পর্যন্ত বোধিজ্ঞান লাভ ঃ – 'সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি এবং ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।'

(এক)

কোন বিষয়-ভিত্তিক ধারণার নেপথ্যে শুধু দূর-অতীত নয়, সদ্য-বিগত অতীতের ভূমিকা বর্তমান। বঙ্কিমের সাহিত্য ও ধর্মভাবনায় তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেই অতীতের দুই অধ্যায় – প্রথমটি ইয়ংবেঙ্গলের যুগ, অপরটি ব্রাহ্মধর্মের। ১৮২৬-এ হিন্দু কলেজে শিক্ষকরূপে ডিরোজিও'র যোগদানের পর একদল ইংরেজি শিক্ষানুরাগী তরুণের উচ্ছ্বাস কেমনভাবে

উচ্ছৃঙ্খলতায় অবসিত, তার দৃষ্টান্ত বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্গত। বাঙালি হিন্দুঘরের এই তরুণেরা হিন্দু কলেজে শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণায় তৎপর ছিলেন। হিন্দুধর্ম ও সমাজের আচার বিচার – সবই তাদের কাছে ঘৃণ্য, সুতরাং সর্বান্তঃকরণে পরিত্যাজ্য। পরিবর্তে কেউ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে অতিরিক্ত উৎসাহী, কারো বা ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থা। দেশের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী। ইয়ংবেঙ্গলের প্রভাব গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তৃত না হলেও শহর ও শহরতলীতে এই আন্দোলনে হিন্দু সমাজ কম্পমান। সেই কারণে প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাষায় তা 'ইয়ং ক্যালকাটা' নামে অভিহিত। ১৮৪০-৪২ পর্যন্ত এর দাপট বর্তমান। পরবর্তী সময়ে এই কালাপাহাড়ী আন্দোলনের ব্যর্থতা বঙ্কিমচন্দ্রের অজানা নয়।

এই ভাবান্দোলনের পথ ধরেই ব্রাহ্মধর্মের উত্থান। রামমোহনে তার গৌরচন্দ্রিকা আর দেবেন্দ্রনাথে যাত্রা শুরু। তবে রামমোহন আক্ষরিক অর্থে ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক নন, ব্রাহ্মসভার প্রতিষ্ঠাতা (সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে)। ১৮৩৩-এ রামমোহনের তিরোধানের দশ বছর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম ২০ জন সঙ্গীসহ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন (১৮৪৩)। তিনি হিন্দুর পৌরাণিক কালের সাকার পূজায় বিশ্বাসী না হয়ে বৈদিক যুগের নিরাকার ঈশ্বর-উপাসনায় আস্থাশীল। কিন্তু অন্যধর্মের প্রতি অপ্রীতি নিয়ে যেখানে কোন নবধর্মের অভ্যুত্থান, সেখানে তা দীর্ঘায়ু হওয়া কঠিন। যে তরুণ যুবক পিতৃপিতামহের গৃহদেবতার প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ, অথচ পিতার ভয়ে দেবারতিকালে পূজামণ্ডপে উপস্থিত থেকেও কৌশলে দেবতাকে প্রণাম না জানিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনায় অভ্যস্ত[১], তাঁর প্রচলিত ধর্মসংস্কারের পরিণতি করুণ। ১৮৪৩-এ প্রকৃত ব্রাহ্মধর্মের শুরু থেকে ১৮৭৮ পর্যন্ত – মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে এক ব্রাহ্মসমাজ তিনভাগে বিভক্ত – আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। শেষ পর্যন্ত ১৮৭৮-এ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শিবনাথ শাস্ত্রীর বেদনাদায়ক স্বীকারোক্তি ঃ "এরূপ দলাদলির মাথায় ধর্ম টেঁকে না, আমরা সেই যে ধর্ম হারাইয়াছি তাহার সাজা এতদিনে ভোগ করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজের অধঃপতন আমাদের পাপের শাস্তি।"[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন ৪০ বছর।

ইয়ংবেঙ্গলের ধর্ম ও সমাজ বিপ্লবের প্রত্যক্ষদর্শী নন বঙ্কিম, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের উত্থান ও পরিণাম তাঁর জীবনকালের ঘটনা। চলমান কালের প্রভাবে হিন্দুধর্ম ও সমাজের নানা অসঙ্গতির কারণ অনুসন্ধান তাঁর উদ্দেশ্য। জীবনে ধর্মের স্থান কোথায়, তার প্রভাব কতখানি – এমনই চিন্তায় আত্মমগ্ন তিনি – 'এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়!' জীবন তো শুধু ধর্মান্তর গ্রহণে সার্থক নয় কিংবা নতুন ধর্ম গ্রহণ করে তা দশজনের মধ্যে প্রচার করাই একমাত্র ইষ্টলাভ নয়। তাই তাঁর কথা – 'সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে।' বঙ্কিমের পূর্বসূরিগণ, যাঁরা বিদেশী শাসকদের ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত অথবা ধর্মসংস্কারের নামে এক নবধর্ম প্রবর্তনায় উৎসাহী, তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে

ধর্মের দোষগুণগুলি নতুন শিক্ষার আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ না করে স্বধর্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট – বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য এখানেই। নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দিকগুলি বিচার করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। দু'একটি দৃষ্টান্ত ঃ

(১) "ধর্ম্মোপত্তি ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। ইহারও অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিক প্রথায় করিতে হইবে।"[৩]

(২) "আমি কোন ধর্মকে ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করিব না। ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি আছে ইহাই স্বীকার করি।"

(৩) "যেদিন য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম একত্র হইবে, সেইদিন মনুষ্য দেবতা হইবে।"

ধর্মের মূল বিষয়-চিন্তায় উৎকণ্ঠ বঙ্কিমের রচনা 'ধর্ম্মতত্ত্ব' বা 'অনুশীলন'। অপরদিকে স্বধর্মের প্রতি এই 'উৎকণ্ঠা' তথা ব্যাকুলতার অভাব খ্রীষ্টধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত তৎকালীন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির কথায় ও কাজে লক্ষণীয়। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত প্রতিভাবান ব্যক্তিও হিন্দুধর্মের আচার-বিচারকে ধর্ম মনে করে তরুণ বয়সে 'এনকয়ারার' পত্রিকায় এক দর্শিত উক্তিতে সোচ্চার – 'We disregard all that they say or do ...'[৪] 'Atteniumn' নামে মাসিক পত্রে মাধবচন্দ্র মল্লিকের হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ঃ "If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism"।[৪ক]

ব্রাহ্মরাও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছিলেন। ধর্মের নামে এই সামাজিক বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধানে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অনন্যমনা।

(দুই)

প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের 'প্রচার'-এ 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' বিষয়ক বঙ্কিমের কয়েকটি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর জীবদ্দশায় গ্রন্থে এটি অমুদ্রিত। বঙ্কিম জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রীরামপুরে একটি সাহিত্য সভার সভাপতির ভাষণে সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সর্বপ্রথম এই রচনার উল্লেখ এবং গ্রন্থের নামকরণও তাঁর।[৫]

রচনার শুরুতেই বঙ্কিমের কথা, আচার পালন হিন্দুধর্ম নয়। "ইহা যদি হিন্দুধর্ম হয়, তবে আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমরা হিন্দুধর্মের পুনর্জীবন চাহিনা।" এ বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যা, আচারনিষ্ঠ কিন্তু পরস্বাপহারী, মিথ্যাবাদী হিন্দু – ধার্মিক নন। পরন্তু আচারভ্রষ্ট কিন্তু সত্যবাদী, উদার হৃদয়, ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই প্রকৃত হিন্দু।

হিন্দু শাস্ত্র কি? এই প্রসঙ্গে 'মনুসংহিতা'র বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বর্তমানে হিন্দু সমাজের কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি ইতিহাস, সমাজ ও সাহিত্যালোচনায় 'মনুবাদী', 'ব্রাহ্মণ্যবাদী' ইত্যাদি শব্দগুলির যথেচ্ছ ব্যবহারে উন্নাসিক।

যেন তাঁদের চেয়ে বড় সমদৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিত আর নাই। 'মনুসংহিতা'য় তথাকথিত

শাস্ত্রবচনের বঙ্কিমী ব্যাখ্যায় এর উত্তরদান – ''মনুতে আছে যে, যুদ্ধকালে শত্রু সেনাদের যে জলাশয়গুলি স্নান-পানের জন্য ব্যবহৃত, তাহা নষ্ট করিবে।'' কিন্তু – ''যে হিন্দুধর্মে তৃষিতকে এক গণ্ডুষ জলদানের অপেক্ষা পুণ্য নাই বলে'' – সেখানে মনুর বিধান গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং মনুর এই উপদেশ 'হিন্দুধর্ম নয়, যুদ্ধনীতিমাত্র'।

আধুনিক কালের যুদ্ধে যা পোড়ামাটিনীতি নামে পরিচিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য ঃ ''যদি মন্বাদি ঋষিরা অভ্রান্ত হন, তবে তাঁহাদের সকল উক্তিগুলিই ধর্ম্ম – যদি তাহাই ধর্ম্ম হয়, তবে ইহা মুক্ত কণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুধর্ম্মানুসারে সমাজ চলা অসাধ্য। . . . এইরূপ ভুরি ভুরি উদাহরণের দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে সর্ব্বাংশে শাস্ত্রসম্মত যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহা কোনরূপে এক্ষণে পুনঃসংস্থাপিত হইতে পারে না, কখন হইয়াছিল কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ।''

এ বিষয়ে বঙ্কিমের দুটি পথ নির্দেশ – ''এক, হিন্দুধর্ম একেবারে পরিত্যাগ করা, আর এক, হিন্দু ধর্ম্মের সারভাগ অর্থাৎ যেটুকু লইয়া সমাজ চলিতে পারে, এবং চলিলে সমাজ উন্নত হইতে পারে, তাহাই অবলম্বন করা।'' অর্থাৎ ধর্মকে যুগোপযোগী রূপদান এবং প্রয়োগের দ্বারা জীবনের মনোন্নয়ন তথা মনের উৎকর্ষ সাধন।

যাঁরা জন্মলব্ধ ধর্ম পরিত্যাগ করে ধর্মান্তরগ্রহণের সমর্থক, তাঁদের প্রতি তাঁর প্রশ্ন, কোন ধর্মকে আশ্রয় করা উচিত। হিন্দুধর্ম ব্যতীত – ''পৃথিবীতে আরও যে কয়টি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইসলামধর্ম্ম এবং খৃষ্টধর্ম্ম, এই তিনটি ধর্ম্মই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহার আসন গ্রহণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। কেহই হিন্দুধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।'' আর ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ঃ ''ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখামাত্র। ইহার এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, উহা ভবিষ্যতে সামাজিক ধর্ম্মে পরিণত হইবে।''

উপর্যুক্ত আলোচনায় মনে হওয়া স্বাভাবিক, হিন্দুধর্মের প্রচার বোধকরি বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বধর্মে অবস্থান, তার কারণ অনুসন্ধান এবং জীবনের সঙ্গে ধর্মের সমন্বয় সাধনের উপায় সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা-ভাবনার প্রতি আলোকপাত এর লক্ষ্য।

(তিন)

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-ধর্মের প্রকাশ সাহিত্য চিন্তা বা সাহিত্য সৃষ্টিতে। প্রধানত তাঁর হাতেই বাংলাসাহিত্যের বিকাশ ও বিস্তার। তার আগে বাংলাকাব্যে মধুসূদনের নাম স্মর্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্র একহাতে সাহিত্য সৃষ্টি, অপর হাতে সাহিত্য-সমালোচনায় পারঙ্গম, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সব্যসাচী।

ব্যক্তিগত ধর্মবোধ যখন সাহিত্য ধর্মে রূপান্তরিত, তখন তার প্রকৃতি কেমন সেই দৃষ্টান্ত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। ১৮৬২-তে উপন্যাসখানির রচনা শুরু এবং ১৮৬৪-তে সমাপ্তি। ১৮৬৫-তে গ্রন্থাকারে প্রকাশ। বঙ্কিমের বয়স তখন সাতাশ বছর।

মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের জীবনে দুই নারীর আবির্ভাব। প্রথমজন ষোড়শী তিলোত্তমা, দ্বিতীয়জন 'দ্বাবিংশতিবর্ষীয়া' আয়েষা। বলাবাহুল্য, দুই নারী দুই ভিন্ন ধর্মীয়া এবং দু'জনেই জগৎসিংহের প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী। এই কাহিনীতে দু'জনের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস প্রেমধর্মে সমন্বিত। তাই বন্দী জগৎসিংহের সামনেই পিতার সেনানায়ক ওসমানের মুখের উপর নবাবপুত্রী আয়েষার নির্ভীক উচ্চারণ – "এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।' শুধু একবার নয়, দ্বিতীয়বারে তার মনোভাব আরও স্পষ্ট – "শুন ওসমান, আবার বলি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর, যাবজ্জীবন অন্য কেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কাল যদি বধ্যভূমি ইঁহার শোণিতে আর্দ্র হয়' বলিতে বলিতে আয়েষা শিহরিয়া উঠিলেন –, 'তথাপি দেখিবে হৃদয়-মন্দিরে ইঁহার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্তকাল পর্যন্ত আরাধনা করিব।'"

প্রেমের ধর্মে আয়েষার স্থান কোথায় তার প্রমাণ উপন্যাসের 'সমাপ্তি' অধ্যায়ে। জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার বিবাহ রাত্রিতে জগৎসিংহের আমন্ত্রণে গড়মন্দারণে আয়েষার উপস্থিতি। নিজের বহুমূল্য অলংকারগুলি আয়েষা – 'সহস্তে তিলোত্তমার অঙ্গে পরাইতে লাগিলেন।' তারপর অশ্রুভারাক্রান্ত আয়েষার শেষ সংলাপ – "আমি যে রত্নগুলি দিলাম, অঙ্গে পরিও। আর আমার – তোমার সার রত্ন হৃদয় মধ্যে রাখিও।"

ত্যাগের মধ্যে ভোগের যে ভারতীয় আদর্শ, আয়েষা চরিত্রটি তার নিদর্শন।

কিন্তু নরনারীর জীবনলীলায় প্রেমধর্ম সমগ্র জীবনের খণ্ডাংশ মাত্র। মিলন-বিচ্ছেদ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি তার এক-একটি অধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মভাবনার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত। তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত 'আনন্দমঠ'। গ্রন্থাকারে আনন্দমঠের প্রকাশকাল ১৮৮২ খ্রীঃ। তখন তাঁর বয়স চুয়াল্লিশ বছর।

সাহিত্য সৃষ্টিতে বঙ্কিম তাঁর Cosmic Conciousness-এর সঙ্গে Social Conciousness-এ কতখানি আত্মস্থ, 'আনন্দমঠ'-এ তা লক্ষণীয়। এখানে সামাজিক চেতনা রাষ্ট্রীয় চেতনায় রূপান্তরিত। তুর্কী পাঠান ও মোঘল রাজত্বকালে রাজশক্তি যত প্রবল হোক না কেন, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর সেই প্রভাব তেমন ছিল না। কেননা মরু প্রদেশের যোদ্ধজাতি যুদ্ধজয়ের দ্বারা রাজ্য বিস্তারে দক্ষ হলেও শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের ক্ষেত্রে উদাসীন। ফলতঃ ভারতীয় সংস্কৃতি তখনও নিজস্ব ধারায় প্রবাহিত। কিন্তু ইংরেজ আমলে রাজত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে তার স্বরূপ লক্ষণ, – সাহিত্য সমালোচক মোহিতলালের ভাষায় 'Cultural Conquest' নামে কথিত। তাঁর মতে বঙ্কিমচন্দ্রের – "পূর্বগামী মনীষীরা প্রায় সকলেই নূতন জ্ঞান ও নূতন বিদ্যালাভের দিকটাই দেখিয়াছিলেন, কেহই ক্ষতির অঙ্কটাও হিসাব করিয়া দেখেন নাই।"[৬] অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিজয়ে 'স্বধর্মের উপর এই পর ধর্মের' আধিপত্য লাভ।

সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচারে মতভেদ থাকলেও 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র জাতিপ্রেম তথা জাতীয়তা ধর্মের প্রবক্তা। মনে রাখা প্রয়োজন, ১৮৮২-তে (১৫ ডিসেম্বর) 'আনন্দমঠ'

গ্রন্থাকারে প্রকাশের তিন বছর পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা লাভ (১৮৮৫)। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থখানি স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ দেশকর্মীদের প্রেরণার উৎস। আর 'বন্দেমাতরম্' শুধু শ্লোগান নয় – মন্ত্রবিশেষ। সেই মন্ত্র শক্তিতে উদ্বুদ্ধ সন্ন্যাসী ভবানন্দের মাতৃবন্দনার নামে দেশবন্দনায় মুগ্ধ মহেন্দ্র সিংহের কথা – 'এত দেশ, এত মা নয় –'। তার উত্তরে ভবানন্দ – ''আমরা অন্য মা জানি না। – জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী – ।''

জাতীয়তা-ধর্মের প্রথম স্তর জন্মভূমিকে জননী জ্ঞানে আরাধনা। বঙ্কিমের অসাধারণ কল্পনায় এই জন্মভূমির রূপ ও গুণ বর্ণিত। অথচ তিনি যে তথাকথিত ধার্মিক হিন্দু নন, তা এই উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে সত্যানন্দকে কথিত চিকিৎসকের উপদেশে স্পষ্টঃ

''তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম্ম নহে, সে-একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম। তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম – ম্লেচ্ছরা যাঁহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে – তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে।''

অন্য সব দেবদেবীর চিন্তা না করে দেশকে দেবতাজ্ঞানে কল্পনা ও আরাধনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব' রচনাটি তারই নিদর্শনঃ

''কোথা মা। কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! . . . সেই কালস্রোত মধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ প্রতিমা! . . . এসো মা, গৃহে এসো – যাঁহার ছয় কোটি সন্তান, – তাঁহার ভাবনা কি?''

জাতিপ্রেমের আকর্ষণে সকলকেই একসূত্রে গ্রথিত করার কল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্র অনন্যমনা।

(চার)

'নবজীবন' এবং 'প্রচার'-এ হিন্দুধর্মবিষয়ক তাঁর তিনটি রচনা ধারাবাহিক প্রচারিত হয়। (১) অনুশীলন ধর্ম-বিষয়ক, (২) দেবতত্ত্ব বিষয়ক, এবং (৩) কৃষ্ণচরিত্র।[৭] তার মধ্যে ইংরেজি ১৮৮৬-তে কৃষ্ণচরিত্র এবং ১৮৮৮-তে ধর্মতত্ত্ব (অনুশীলন) গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হবার সময় কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়।

কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে ১৩০১ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য – ''. . . বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না, খড়্গধারিণীও ছিল। বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে সে আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথাঞ্চিত চেতনালাভ করিত। . . . বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ করিয়া তাহার সার এবং অসার ভাগ পৃথককরণ, তাহার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ এমন নিঃসংকোচে করিয়াছেন যে এখানকার দিনে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।''[৮]

শুধু কৃষ্ণচরিত্র নয়, ধর্মতত্ত্ব বা অনুশীলনে তার প্রমাণ আছে। এখানে তাঁর প্রতীতি – 'The

Substance of Religion is Culture'। 'মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম্ম'। বঙ্কিমের অনুশীলন তত্ত্বে এই মানব-মনকে কর্ষণ করে সোনার ফসল পাবার কথা পরিশীলিত ভাষায় ও বৈদগ্ধ্যের ছটায় বর্ণিত।

'শ্রীমদ্ভগবদগীতায়' তাঁর বক্তব্য – "যাহার যে ধর্ম্ম, তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। এখন মনুষ্যের ধর্ম্ম কি? যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব, তাহাই মানুষের ধর্ম্ম।... জ্ঞান ও কর্ম্ম মানুষের স্বধর্ম্ম।... কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ স্বধর্ম্ম স্থানীয় করেন, কেহ কর্ম্মকে ঐ রূপ প্রধানতঃ স্বধর্মস্বরূপ গ্রহণ করেন।"

অথচ তিনি ধর্ম ও তত্ত্বের কট্টর প্রচারক নন। ধর্ম যখন ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয় তখন তার একরূপ, তার তা যখন প্রচারের নিশান তুলে ধরে জনসমাজে আধিপত্য বিস্তারের উন্মাদনায় একাগ্রচিত্ত, তখন তার প্রকৃতি ভিন্ন। প্রথমটি আত্মশুদ্ধির সাহায্যে আত্মদর্শন, দ্বিতীয়টি আত্মম্ভরিতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রচার। ধর্ম মৃৎপাত্র নয় যে ইচ্ছামত তা বর্জনীয়। তা জীবনেরই অংশ। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের প্রফুল্ল চরিত্রে এই স্বধর্মে স্থিতির লক্ষণ প্রকট। ধনী শ্বশুর কর্তৃক বিতাড়িত এক নারীর দরিদ্রা জননীর কাছে আশ্রয় গ্রহণ। তাঁর মৃত্যুর পর নিরাশ্রয় অবস্থার মধ্যে কেমনভাবে জীবনযুদ্ধে অনমনীয় প্রফুল্ল দেবীরাণিতে উত্তীর্ণ, সেই কাহিনী উপন্যাসের বিষয়। অশনে বসনে, নিদ্রায়, বিদ্যাচর্চা ও শরীর চর্চায় তাকে পরিপূর্ণ নারীরূপে গড়ে তোলার চেষ্টায় ভবানী পাঠক সফল। প্রফুল্ল থেকে দেবীরাণি এবং পুনরায় প্রফুল্লে উত্তরণ তার নিদর্শন।

(পাঁচ)

উপসংহারে বলা সঙ্গত, তরুণ বয়স থেকে যিনি জীবন জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল এবং লোক প্রচলিত উত্তরে তৃপ্ত না হয়ে তার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য ত্যাগ স্বীকারে অকুণ্ঠিত, তাঁর ধর্ম ভাবনার বিস্তার ও গভীরতা সামান্য নয়। বিচার-বিশ্লেষণও যুক্তি-তত্ত্ব গ্রাহ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাল উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে নয়ের দশক পর্যন্ত। সেই যুগের অন্যতম চিন্তানায়ক হিসাবে তিনি সুপরিচিত। কিন্তু বিশ শতকের কিছু বুদ্ধিজীবীর বিচারে তাঁর অপরাধ অনেক। (১) 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে হিন্দুর মূর্তিপূজা-কল্পনার তিনি রূপকার, (২) 'আনন্দমঠ'-এ সাম্প্রদায়িকতার প্রবক্তা, (৩) বিশ্বপ্রেমের পরিবর্তে জাতিপ্রেমের পথিকৃৎ এবং (৪) ধর্মভাবনায় স্বধর্মের পুনর্নবীকরণের প্রধান পুরোহিত। এই কোনটিই আধুনিক বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত যার একটি পংক্তি 'তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।' এর তাৎপর্য বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে তৎকালীন প্রবাসী সম্পাদক পরম ব্রাহ্ম রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য – "এটি পৌত্তলিকতা নয়।... অনেক বিখ্যাত মানুষ সম্বন্ধে বলা হয়, 'তাঁহাদের মূর্তি দেশের লোকেদের বা জগদ্বাসীর হৃদয়মন্দিরে গৃহে গৃহে চিরকাল বিরাজ করিবে।' তাহাতে পৌত্তলিকতা হয় না।...

ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে ও ব্রহ্মসংগীতে শিব, শঙ্করী, শম্ভু, বিষ্ণু, মহেশ প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু তজ্জন্য ব্রাহ্মদিগকে কেহ পৌত্তলিক বলে না।"[৯]

দ্বিতীয় অভিযোগ, 'আনন্দমঠ'-এ তিনি সাম্প্রদায়িকতার প্রবক্তা। কেননা অহিন্দুদের সম্পর্কে ক্ষেত্র বিশেষে কিছু বিরূপ উক্তি। কিন্তু উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্র বিকাশের জন্য প্রয়োজনবোধে লেখকের এই স্বাধীনতা স্বীকৃত। পাত্রপাত্রীর মুখের কথা লেখকের মনের কথা নয়। দেশী-বিদেশী রচনায় এমন দৃষ্টান্ত বর্তমান। প্রমাণ – শেকস্‌পীয়ারের 'ওথেলো', মধুসূদনের 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রভৃতি। প্রাসঙ্গিকভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বঙ্কিম মানসের সামান্য পরিচয়দান প্রয়োজন। মীর মশারফ হোসেনের 'গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু' গ্রন্থের সমালোচনাকালে তাঁর মন্তব্য ঃ

"তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না। ইঁহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়। বাঙ্গালা, হিন্দু-মুসলমানের দেশ – একা হিন্দুর দেশ নহে। . . . বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য জন্মে। . . . জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।" ১৮৮২-তে 'রাজসিংহ' উপন্যাসের উপসংহারে তাঁর কথা – "হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না।" দূরদর্শী বঙ্কিমের আরও একটি মন্তব্য – 'ধর্ম নেশন গড়ে না।' এর প্রমাণ কতখানি সত্য, তার প্রথম প্রমাণ ইউরোপ, দ্বিতীয় প্রমাণ আরব রাষ্ট্রগুলি এবং তৃতীয় প্রমাণ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশ।

তাঁর বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ, ধর্ম ভাবনায় স্বধর্মের পুনর্নবীকরণে বঙ্কিমচন্দ্র প্রধান পুরোহিত। পূর্বেই উল্লিখিত যে, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মকে সঠিক না জেনে আচার-বিচার যাঁদের কাছে ধর্ম-হিসাবে বিচারণীয় এবং সেই কারণে স্বধর্ম ত্যাগ করে পর ধর্মে অনুরক্তি, তাঁদের পক্ষে এমন অভিমত স্বাভাবিক।

বঙ্কিমচন্দ্র – যা 'ধর্মশাস্ত্রসম্মত', তা-ই ধর্ম্ম এবং হিন্দুর 'ধর্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ' তা অধর্ম – এর সমর্থক নন। তাঁর কথায় – হিন্দুদের প্রাচীন গ্রন্থে এ বিষয়ে তেমন কোন সমর্থন দুর্লক্ষ্য। ১৮৯২-এ কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লেখা এক চিঠিতে তাঁর বক্তব্য ঃ

"আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী নহি এবং ধর্মশাস্ত্রবেত্তার আসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। . . . আমি এইরূপ বুঝি ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই আছে তাহাই হিন্দুধর্ম্ম নহে। হিন্দুধর্ম্ম অতিশয় উদার। স্মার্ত ঋষিদিগের হাতে বিশেষতঃ আধুনিক স্মার্ত রঘুনন্দনাদির হাতে ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্মার্ত ঋষিগণ হিন্দুধর্ম্মের স্রষ্টা নহেন। হিন্দু ধর্ম সনাতন – তাঁহাদিগের পূর্ব হইতেই আছে। অতএব সনাতন ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্মশাস্ত্রে বিরোধ অসম্ভব নহে। যেখানে এইরূপ বিরোধ দেখিব সেখানে সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। ধর্ম্মে এবং হিন্দুধর্ম্মে কোন বিরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেমধর্ম, সাহিত্য ধর্ম এবং মানবধর্ম একটি যোগসূত্রে গ্রথিত – যার পরিণতি সনাতন ধর্মে বিশ্বাস। অথচ যে সনাতন ধর্ম তাঁর মতে তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা নয় তিনি তার সমর্থক। হিন্দুধর্মে আস্থা রেখেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান। ব্যক্তি জীবনে ও

সাহিত্যে-এর প্রমাণ বিধৃত।

সংসারের দাবি পূরণে বঙ্কিমচন্দ্র কতখানি সফল, তা তাঁর জীবনী লেখকদের গবেষণার বিষয়; কিন্তু সমাজের দাবিপূরণে তাঁর সার্থকতা অবিসংবাদিত। সমাজভাবনা, সাহিত্য ভাবনা ও ধর্মভাবনার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে মানব কল্যাণ চিন্তায় তাঁর উত্তরণ।

সন্ধানসূত্র ঃ– (১) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী; (২) শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত; (৩) বঙ্কিম রচনাবলী, ২য়, পৃঃ ৮৩৬; (৪) ও (৪ক) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী; (৫) বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড; (৬) বঙ্কিম বরণ, মোহিতলাল মজুমদার; (৭) বঙ্কিম রচনাবলী, ২য়; (৮) আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ; (৯) বন্দেমাতরম, জগদীশ ভট্টাচার্য্য।